ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ।। ২৫ ফাল্গুন, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ৯ মার্চ, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

বিষ্ণুপুর উপনির্বাচনে জোটের জয়

শোচনীয় পরাজয়ে দিশাহারা সিপিএম

নিশাকর সোম।। যা অনিবার্য ছিল—তাই হয়েছে। বিষ্ণুপুরে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে নির্বাচনমন্ডলীর বিক্ষোভ লক্ষাধিক ভোটে ফুটে উঠলো। সিপিএম-এর যে পরাজয় পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু হয়েছিল তা, আজও অব্যাহত। তিন দশক ধরে সিপিএম-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট যে অন্যায়, অবিচার, অনাচার, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিফল পাওয়া শুরু হয়েছে। জনসাধারণের এই প্রতিবাদ আরও তীব্র থেকে তীব্রতর-তীব্রতম হবে।

বুদ্ধদেব

বিমান

উপনির্বাচনের এই ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে বিমান বসু এবং বিনয় কোঙার ভিন্নসুরে কথা বলেছেন। বিমান বসু বলেছেন—''এই ফলাফল জানা ছিল।'' কারণটা অবশ্যই স্পষ্ট—পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকায় সিপিএম ২৬ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিল। বিনয় কোঙার বলেছেন, ''মানুষ তো না-বুঝে বিষও খায়।'' বিনয়বাবু নিজের নামের মর্যাদা রাখতে পারেননি। তাই সব সময়ে অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য কথা বলেন। আর এই বিষয়ে জ্যোতি বসু তো রাজ্য-সম্পাদকমন্ডলীর সদ্য-সমাপ্ত সভায় তীব্র নিন্দা করেছেন। বিষ্ণুপুরের উপনির্বাচন নিয়ে বুদ্ধদেববাবুর মন্তব্য—''অপ্রত্যাশিত'' আর বিমান বসু—''প্রত্যাশিত''(!)— কী অপূর্ব মতৈক্য।

নির্বাচনের এই ফলাফল দেখিয়ে দিল সিপিএম গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে। সিপিএম-এর উপর জনগণ বীতশ্রদ্ধ।

বিনয় কোঙার আরও মন্তব্য করেছেন—''ভেবেছিলাম, পঞ্চায়েত ফলাফল থেকে একটু শুধরে নেওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের ''দক্ষ'' কর্মীর অভাবে তা হল না।'' বিনয়বাবু, দক্ষ কর্মী তৈরি করতে পারা গেল না কেন? কারণটা স্পষ্ট। শুধু ম্যাসলম্যানদের উপর নির্ভরতা, নেতাদের জন-বিরোধী উক্তি—এই দিয়ে তো পার্টি দক্ষতা বাড়াতে চেয়েছিল। সেটা ব্যর্থ হয়েছে।

বিনয়বাবুর এই উক্তির পিছনে আর একটা মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—সে-মনোভাব হল ''বিমান বসু'' ব্যর্থ, তাই দক্ষ কর্মী নেই। এর পরিবর্তে বিনয় কোঙার অথবা মদন ঘোষ অর্থাৎ বর্ধমান লবির কেউ রাজ্য-পার্টির সম্পাদক হোক—এই প্রক্রিয়াটা আরও শক্তি সঞ্চয় করলো। বিনয় গোষ্ঠীর একনেতা (প্রয়োজনে নাম দিতে পারি) বললেন যে, বিমান বসু তাঁর বশংবদদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। তাঁরা বিমানবাবুকে উল্টো-সিধে বুঝিয়ে ফায়দা লুঠছে।

এই উপনির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে সিপিএম-এর জেলা নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবেই এবং তার ধাক্কা রাজ্য-নেতৃত্বে এসে পড়বেই। মন্ত্রী-নেতা আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা কি নীরব থাকবেন! সিপিএম-এর শাসনের রাজ্য-পাট অবলুপ্তির সূচনা কি ঘটা শুরু হল? এই উপনির্বাচনের জয়ের ''চাপে'' মমতা-প্রণব ঐক্যের বাণী শোনালেন। এটা হবেই জানা ছিল। এরপরের ঘটনা অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচনের পর ফর্মুলাটা এরকম হবে—কংগ্রেস + তৃণমূল + সিপিএম!!!

সত্যিকারের কংগ্রেস বিরোধী দল হিসাবে বেরিয়ে আসবে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলগুলি। তাই কংগ্রেস-বিরোধী জনগণকে বিজেপিকেই ভোট দিতে হবে। কারণ কংগ্রেস-তৃণমূল একই। আর সিপিএম বিজেপি-র বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেসের পেছনে ছিল এবং থাকবেই। রাজ্যের মন্ত্রী তথা সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদকমন্ডলীর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব ইতিমধ্যেই বলেছেন—''যাঁরা আমেরিকার বিরুদ্ধে তাঁদের ভোট দিন।'' এর মানে কি? অদূর ভবিষ্যতে কি তাঁরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করার শক্তি পাবেন? সিপিএম নেতৃত্ব মত-পথের দ্বন্দ্বে দীর্ণ। তাঁদের বিদায় দেওয়া দরকার।

সি পি এম-রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী প্রার্থী বদল করলেও শেষ পর্যন্ত চিঁড়ে ভিজবে কিনা সন্দেহ। শেষ মুহূর্তে মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো ''স্বাস্থ্যের কারণে'' নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। কান্তি বিশ্বাসকে প্রার্থী করা হয়নি। তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে চাইছিলেন না। কারণটা বোধ হয় পরাজিত হবার ভয়।

সিপিএম-রাজ্য নেতৃত্ব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রার্থী বদলের 'ঝুঁকি'' নিতে চাননি। এমনকী সাসপেন্ড অলকেশ দাসকে প্রার্থী করার দাবিও উঠেছে।

(এরপর ১৬ পাতায়)

কামানো-কমরেডদের চিনছে মানুষ

গূঢ় পুরুষ।। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুরের উপনির্বাচনে বড় রকম ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীরা পরাজিত হলেন। সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, এই ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আমাদের জনসংযোগের অভাবই এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে।' এই সব মন্তব্যই আংশিক সত্য। পূর্ণ সত্য নয়। সত্য কথাটি হচ্ছে ভোটদাতারা এখন অনেক বেশি সচেতন। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অন্ধ আবেগে ভোট দেন না। ক্ষমতাসীন সরকার জনস্বার্থে জনকল্যাণে কতটা কী করেছে তার মূল্যায়ণের ভিত্তিতেই সমর্থন করে অথবা করে না। এইটাই এখন সারা ভারতেই ভোটদানের নয়া ট্রেন্ড। সাম্প্রতিককালে দেশের চার-পাঁচটি রাজ্যে যে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে যে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ণের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভোটে জয় পরাজয় স্থির রয়েছে। এই নিরিখেই গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে বিজেপি সাফল্য পেয়েছে। মাত্র বছর দুয়েক আগেও এই ট্রেন্ড এতটা প্রকট ছিল না। ভোটদাতাদের আবেগ আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে সহজ জয় পকেটে চলে আসতো। এখন আর অন্ধ সমর্থন ভোটের বৈতরণী পার করছে না। সিপিএমের মসৃণ তৈল চিক্কন ভোটযন্ত্র জয় ছিনিয়ে আনতে পারছে না। সিপিএমের একদা অন্ধ সমর্থকদের এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরেছে। তাঁরাও বিশ্বাস করছেন যে বিগত ৩২ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এখন স্রেফ মার্কসবাদী কামিয়ে নাও পার্টিতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে

উল্লসিত জনতা

(এরপর ৪ পাতায়)

করদাতাদের টাকায় মুসলিমদের জন্য ৩০০ কোটির প্যাকেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্য সরকার কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। বামপন্থীরা নিজেদের বরাবরই সাম্প্রদায়িকতার ঘোর শত্রু বলে নিজেদের দাবি করে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই চ্যাম্পিয়ন দলটি কিন্তু ভোটের লালসায় মুসলিমদের জন্য ৩০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নয়। মুখে অবশ্য ভিন্ন যুক্তি। অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বিধানসভাকে এড়িয়ে মহাকরণে দাঁড়িয়ে এই প্যাকেজ ঘোষণার সময় বলেছেন, সংখ্যালঘুরা পিছিয়ে রয়েছেন। তাই তাদের উন্নয়ণের জন্যই এই বরাদ্দ। উন্নয়ণের প্রশ্ন যখন বরাদ্দ, তখন কিন্তু ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে নতুন মাদ্রাসা তৈরির জন্য। রাজ্যে আরও কয়েকশো মাদ্রাসা নির্মাণে রাজ্য সরকারের এই অর্থ বরাদ্দ ঘোষণা কোন উন্নয়ণে কাজে লাগবে? রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ণ নিয়ে যত সরকারি বেসরকারি সমীক্ষা হয়েছে কেউ বলেনি মাদ্রাসা তৈরি করলে মুসলিমরা উপকৃত হবেন। বরং সকলেই বলেছেন, মুসলিমদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফেরাতে হবে। মাদ্রাসায় অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি পড়াতে হবে। সেই পথে না হেঁটে স্রেফ ভোটের লোভে মৌলভি- মৌলানাদের খুশি করতে আরও মাদ্রাসা খুলতে চলেছে সরকার।

এখানেই শেষ নয়, মাদ্রাসা শিক্ষকদের

(এরপর ৪ পাতায়)

ইউপিএ-র দুর্নীতিকে ইস্যু করবে বিজেপি

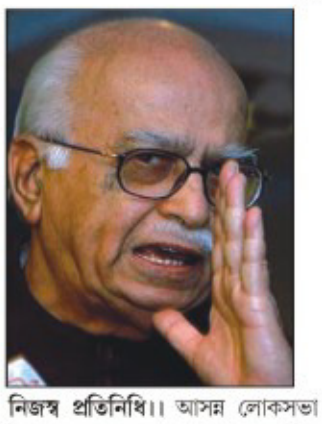

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে সরকার গড়ার লড়াইয়ে বিজেপি ব্রহ্মাস্ত্র করেছে ইউপিএ'র দুর্নীতিকে। এনডিএ'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী সম্প্রতি লোকসভা ভোটের প্রাথমিক পর্বে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইউপিএ-র দুর্নীতি-ই এনডিএ'র অন্যতম ইস্যু। ভোটের মুখে নিরপেক্ষ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়ণের মতো বেশ কিছু এজেন্ডা হাতে নিয়ে এবারের প্রচারে নেমেছে আদবানীর লোকসভা-রথ।

ইলেকশন কমিশন লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে না করতেই, আদবানীজী ইউপিএ'র পাঁচ বছরের শাসনকালের পাঁচকাহন প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইউপিএ সরকার তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের জোরগলায় দাবি করার মতো কোনও কাজই করতে পারেনি। অন্যদিকে এনডিএ তার ছ'বছর সরকারে থাকাকালীন দেশের অভূতপূর্ব সার্বিক উন্নয়ণ ঘটিয়েছে এবং বর্তমানে বিজেপি শাসনে থাকা দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে উন্নয়ণ নজির সৃষ্টি করেছে।''

গান্ধী পরিবারের নাম না করে আদবানীজী বলেন, ইউপিএ সরকারের একটি নির্দিষ্ট পরিবারের 'বংশানুক্রমিক

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

তারুণ্যের অভাবে ভুগছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তারুণ্যের অভাব বোধ করছে সিপিএম। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই সমস্যাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিপিএম এখনও তাদের নির্বাচনের তালিকা প্রকাশ করে উঠতে পারেনি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সিপিএম লোকসভা নির্বাচনে তরুণ প্রার্থী দাঁড় করাতে চাইছে। ইতিমধ্যেই বারাসাতের আরএসপি নেতৃত্ব পুরনো প্রার্থী বদলাতে মরিয়া। সিপিএমও চাইছে তরুণরাই নেতৃত্ব দিক। কিন্তু তরুণদের নির্বাচনে প্রার্থী করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। মালদা, বীরভূমের মতো আসনগুলিতে নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে যুব নেতৃত্বের বড় অভাব।

দলের একাংশ যুব প্রার্থী চাইলেও দলের সে আশা পূরণ করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। ফলে যারা ৫ থেকে ৮ বার নির্বাচনে লড়েছে তাদেরকেই আবার মাঠে নামতে হচ্ছে। এই ধরনের এমপি-দের ভিড়ই রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বে বেশি। অন্যান্য বছর যেখানে সিপিএম তাদের তালিকা প্রকাশ করে দেয়, এবছর এখনও যুব নেতৃত্বের সন্ধান চলছে দলের মধ্যে। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এর মধ্যে খুব একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। সিপিএমের প্রবীণ সাংসদদের তালিকা এইরকম—

বাসুদেব আচারিয়া, সিপিএম, বাঁকুড়া
১৯৮০ থেকে ৮ বার নির্বাচিত সাংসদ।
বয়স-৬৬

হান্নান মোল্লা, সিপিএম, উলুবেড়িয়া
১৯৮০ থেকে সাংসদ, ৮ বার।
বয়স-৬৪

অজয় চক্রবর্তী, সিপিআই, বারাসাত
১৯৯৬ থেকে সাংসদ, ৪ বার।
বয়স-৬৫

তড়িৎ বরণ তোপদার, সিপিএম, ব্যারাকপুর
১৯৯৬ থেকে ৪ বার সাংসদ।
বয়স-৬৭

রুপচাঁদ পাল, সিপিএম, হুগলী
১৯৮০ সাল থেকে ৮ বার নির্বাচিত।
বয়স-৭২

স্বদেশ চক্রবর্তী, সিপিএম, হাওড়া
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। ২ বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। বয়স-৬৫

লক্ষ্মণ শেঠ, সিপিআই, তমলুক
৪ বার বিধায়ক, ৩ বার সাংসদ— ১৯৯৬ থেকে। বয়স-৬২

প্রশান্ত প্রধান, সিপিএম, কাঁথি
১৯৭১ থেকে ৪ বার নির্বাচিত বিধায়ক। ২০০৪-এ রাজ্যসভার নির্বাচিত সাংসদ।
বয়স-৬৯

ডাঃ রামচন্দ্র ডোম, সিপিএম, বীরভূম
১৯৮৯ থেকে ৬ বার সাংসদ।
বয়স-৪৯

গুরুদাস দাসগুপ্ত, সি পি আই।
৩ বার রাজ্যসভার নির্বাচিত সাংসদ-২০০৪
বয়স-৭২

শান্তশ্রী চ্যাটার্জী, সিপিএম, শ্রীরামপুর
৭ বার বিধায়ক ও ২০০৪ এ নির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদ।

এই সময়

নতুন এ টি এম

নিরক্ষর মানুষদের জন্য চবিবশ ঘন্টার এ টি এম পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিল ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক। এই পরিষেবার ফলে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে টাকা তুলতে পারবে। ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম এস সুন্দররাজনের বিবৃতি অনুসারে তামিলনাড়ুতে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ১১টি বায়োম্যাট্রিক এ টি এম চালু করা হয়েছে। দেশে এই পরিষেবা প্রথম।

শিশু নিখোঁজ

শিশু নিখোঁজের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে দিল্লীতে। রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ প্রভাত ঝা'র বক্তব্য অনুসারে, গত ১৩ মাসে রাজধানী দিল্লী থেকে দু' হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হয়েছে। এরমধ্যে দিল্লীর উত্তর-পূর্ব সংলগ্ন জেলাগুলি থেকেই গেছে সাড়ে পাঁচশো শিশু এবং পশ্চিম জেলা থেকে গেছে তিনশো পঞ্চাশ। এই অপহরণ কাণ্ডের সঙ্গে মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে কারবারীদের যোগাযোগ থাকতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

স্বঘোষিত মাতব্বরি

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইত্যাদির পর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত এ আর রহমানের অস্কার বিজয়কে আঁকড়ে ধরল কংগ্রেস। সম্প্রতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, গত পাঁচ বছর ইউ পি এ সরকারের সুশাসনের ফলেই নাকি রহমান অস্কার জিতেছেন। দেশের প্রথম সারির কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষ করেছে, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতেও বাঁকা হাসি হেসে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়েছেন অধিকাংশ চিত্রতারকা ও নির্দেশক। কংগ্রেসের এই দাবির সমালোচনা করেছে বিজেপিসহ অকংগ্রেসী দলগুলি।

মার্কিন সেনায় ভারতীয়

আফগানিস্তান এবং ইরাকে মার্কিন সেনাদের দাপট বজায় রাখতে শেষপর্যন্ত ভারতীয় সেনা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, দু-বছর বসবাস করেছে এমন ভারতীয়দের আমেরিকাতে নাগরিকত্ব দেবার পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো যুবককে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিস্ময়কর সত্য

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরলতম ঘটনা ঘটল আগরতলায়। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর রক্তের গ্রুপ বি-পজিটিভ থেকে এ-পজিটিভ হয়ে যায়। আগরতলায় ক্যান্সার হাসপাতাল সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাঙ্গুটিয়া পশ্চিম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নেপাল চন্দ্র সাহা হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় ভর্তি হলে, তাকে কেমো দেওয়ার পর এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন দেখা যায়।

কেন্দ্রের কোপে সি বি আই!

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সি বি আই কি বর্তমান ইউ পি এ সরকার তথা সরকারের অন্তরাত্মার কোপ-নজরে? সম্প্রতি এমনই গুঞ্জন শুরু হয়েছে দিল্লীর রাজনৈতিক আঙ্গিনায়। তথ্যসূত্র অনুযায়ী, গত কয়েক বছর ধরেই নাকি নীরবে সি বি আইয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছিল। তার ওপর বর্তমান আপৎকালীন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় গুঞ্জন প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, এবছর বরাদ্দ হয়েছে দুশো একচল্লিশ কোটি পনেরো লক্ষ টাকা, যা গতবারের থেকে ১৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা কম।

বহুমুখী তোষণ

ভোটের মুখে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির পরিমাণ বাড়াল বামফ্রন্ট সরকার। গত বছর যেখানে ১৬ হাজার ৫৬৩ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল, এবছর তা বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাজার ৯৩০ জন। টাকার পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। গত বছর বৃত্তির অর্থ ছিল ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। চলতি বছরে তা বাড়িয়ে ৩১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু উন্নয়ণ ও বিত্ত নিগমের যৌথ প্রচেষ্টায় বামফ্রন্ট সরকার এবার সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও কল্পতরু। রাজ্যের বিরোধী মহলের অনেকের মতে, এটাও সরকারের ভোট টানার কৌশল।

গরিবী মাথাতেও

আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চাপ মানুষের মাথার ওপরও প্রভাব ফেলে। এমনই দাবি করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাঁরা উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের ই-ই-জি বিশ্লেষণ করে এই রায় দিয়েছেন। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা মাপা হয় ই ই জি-র মাধ্যমে। বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্য করেছেন দারিদ্র্যের ছাপ মানুষের মাথার কর্মক্ষমতার ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

আত্মগোপন

বাংলাদেশে জওয়ানদের গণকবর উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে বি ডি আর ছদ্মবেশে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে পারে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের পূর্বপাড় দিয়ে ধবরা নদী পেরিয়ে কিছু বাংলাদেশী ঢুকে পড়ায়, গোয়েন্দাদের চিন্তা আরও বেড়েছে। তাদের মতে, বি ডি আর-এর সীমান্ত জেলায় ছদ্মবেশে ঢুকে পড়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। গোয়েন্দা দপ্তর এবিষয়ে যথেষ্ট নজরদারি জারি রেখেছে। বি ডি আর এরাজ্যে আত্মগোপন করলে আন্তর্জাতিক দিক থেকে সমস্যা বাড়বে বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জোটের রাজনীতি

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়িয়াছে।

নির্বাচনে যুযুধান সব রাজনৈতিক দলই নিজ নিজ রণকৌশল স্থির করিতে, বিশেষত কোন্ পক্ষের সহিত জোট বাঁধিলে সর্বাধিক রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়াই ব্যস্ত। কোনও দলের পক্ষেই— কংগ্রেস বা বিজেপি-র মতো জাতীয় দলের পক্ষেও এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক দলগুলির সহিত জোট বাঁধিয়াই সরকার গঠন করিতে হইবে। জোট সরকারের স্থায়িত্ব লইয়া প্রথমে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করিলেও পরে তাহা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রধান বিরোধী দল— বিজেপি জোট গঠন প্রায় সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তবে কংগ্রেস জোট সঙ্গীদের আগের মতো পাত্তা দিতে রাজি নয়। নির্বাচনী প্রচারে নিজেদের জন্যই শুধু ভোট চাইবে বলিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে।

আসলে কংগ্রেস কখনও তাহার জোট সঙ্গীদের লইয়া সন্তুষ্ট ছিল না। জোট সঙ্গীদের লইয়া চলিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অতীত রেকর্ড খুবই অনিশ্চিত। ১৯৭৯ সাল হইতেই ইহার শুরু। সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইয়া কংগ্রেস সেইসময় কেন্দ্রে চরণ সিং সরকারের পতন ঘটাইয়াছিল। রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেস কখনও জোটের সঙ্গী হইয়াছে, কখনও জোটের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। তামিলনাড়ু ইহার উদাহরণ।

সম্প্রতি কংগ্রেস আবার নিজেদের দাম্ভিকতা জাহির করিয়াছে। জাতীয় স্তরে কাহারও সহিত নির্বাচনী সমঝোতা করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। পরিবর্তে বিভিন্ন দলের সহিত রাজ্যভিত্তিক সমঝোতা করিবে। শরদ পাওয়ারের এন সি পি এবং মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কংগ্রেসের এই কৌশল। মহারাষ্ট্রের বাহিরে পাওয়ার এবং উত্তরপ্রদেশের বাহিরে মুলায়ম সিং যাহাতে অন্য কোনও রাজ্যে আসন দাবি করিতে না পারে— এই লক্ষ্যেই এমন ঘোষণা। অবশ্য দুই দিন যাইতে না যাইতেই কংগ্রেস ক্ষুব্ধ পাওয়ার ও মুলায়মের কাছে শান্তির আবেদন জানাইয়াছে।

বিজেপিও যে ওই চাপ হইতে মুক্ত এমন নয়। এন ডি এ-র অধিকাংশ শরিক দলই বিজেপির কাছে বেশি সংখ্যক আসন দাবি করিতেছে। বিহারের জে ডি (ইউ) এবং ওড়িশার বিজেডি-র এই দাবির কিছু ভিত্তি থাকিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নীতিশ কুমার ও নবীন পট্টনায়েক নিজেদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুই রাজ্যের মধ্যে ওড়িশাই বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা, এই রাজ্যে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বিজেপির দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী শিবসেনা ক্ষুব্ধ। আপাতদৃষ্টিতে এন সি পি-র প্ররোচনাতেই শিবসেনার এই বিদ্রোহ বলিয়া মনে হইতেছে। শিবসেনা মহারাষ্ট্রে বিজেপির কাছে আরও বেশি আসনের দাবি জানাইতেছে। পাঞ্জাবে আবার উল্টো চিত্র। বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্যের ভিত্তিতে সেখানে বিজেপি নেতারা অকালি দলের কোটা হইতে লোকসভায় আরও একটি আসন দাবি করিতেছে। হরিয়ানায় আই এন এল ডি, উত্তরপ্রদেশে অজিত সিংয়ের আর এল ডি এবং অসমে এ জি পি-কে জোটসঙ্গী করায় ওইসব রাজ্যের নেতারা ক্ষুব্ধ। এত সবের পরও বলা যায়, এন ডি এ ভাঙ্গিয়া যাইবার মতো কোনও অবস্থার মুখোমুখি বিজেপিকে হইতে হয় নাই। অন্যদিকে সুবিধাবাদী অমর সিং, উচ্চাকাঙ্ক্ষী শরদ পাওয়ার, হতাশ রামদোস, একগুঁয়ে লালু যাদব ও লালু বিরোধী রামবিলাস পাশোয়ান কংগ্রেসের কাছে নিজেদের দাবির বহর বাড়াইয়া চলিয়াছে।

এইসব চাপের পরেও ইউ পি এ হয়তো টিকিয়া থাকিবে। কিন্তু নির্বাচনের পর শরদ পাওয়ার, মুলায়ম সিং, চন্দ্রবাবু নাইডু অথবা জয়ললিতার মতো নেতারা জোটবদ্ধ হইয়া আবার একবার দেবগৌড়া সরকার গড়ার মতো পরীক্ষা করিতে পারে এবং সেই সরকারকে সমর্থন জানাইবার জন্য কংগ্রেসকে আহ্বান করিতে পারে। আবার একইভাবে বিজেপিকেও বাহির হইতে সমর্থন জানাবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে। এক্ষেত্রে 'সেকুলার' মায়াবতীর ভূমিকাটি কী হইবে তাহা লক্ষণীয়। কেননা, ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশে বিজেপিকে সরকার গড়িতে মায়াবতী তিনবার সমর্থন জানাইয়াছিল।

দুই প্রধান জাতীয় দলের জোটসঙ্গীদের মনোভাবই হইল— ইউ পি এ কিংবা এন ডি এ-র প্রয়োজন দিল্লীতে সরকার গঠন করিবার জন্য— রাজ্যের জন্য এই জোটের কোনও প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রে সরকার গঠনের সম্ভাব্য সবদিক খোলা রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জী এই উদ্ভট সূত্রটিকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর করিয়াছেন। একটি জাতির স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ইহা কোনও শুভ সঙ্কেত নহে।

এবারের লোকসভা নির্বাচন (২০০৯)

তথাগত রায়

প্রতি বছর যেমন ঘুরে ঘুরে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত আসে, তেমনি ঘুরে ঘুরে নির্বাচনও আসে। এটাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি—সৌদি আরবের মতো রাজতন্ত্র এবং চীনের মতো একদলতন্ত্র আজ ব্যতিক্রম। আমাদের দরজাতেও এসে গেছে লোকসভা নির্বাচন। এর চেহারাটা পর্যালোচনা করতেই এই নিবন্ধ।

২০০৪-এ শেষ লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল, তাতে পালাবদল হয়েছিল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু দুটোর চেহারা এক ছিল না। এন.ডি.এ. সরকারের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, উপনেতা ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানী এবং বাকি দলগুলি এঁদের নেতৃত্ব সানন্দে মেনে নিয়েছিল। অপরপক্ষে এঁরাও ওই সব দলের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন না। অপরপক্ষে, প্রথমত ইউ.পি.এ-র নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো সংখ্যাই ছিল না, এখনও নেই। লোকসভায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে সাংসদ প্রয়োজন হয় ২৭৩, আর ইউ.পি.এ-র গরিষ্ঠতা ছিল—তার মধ্যে কংগ্রেসের মাত্র ১৪৫। ইউ.পি.এ. সরকার চালিয়েছে প্রথমদিকে বাম পার্টিদের (প্রধানত সি.পি.এম-এর) সমর্থন নিয়ে এবং পরে সমাজবাদী পার্টির সমর্থন ও কিছু দলছুট এম পি-র সমর্থনে, যা নগদ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল। ইউ.পি.এ-র কোনও পরিষ্কার নেতৃত্ব ছিল না—একেক পার্টির নেতা একেক দিকে একে টেনেছে, আর ইউ পি এ তখনকার মতো সেদিকে হেলে গেছে। এর চেয়ারপার্সন যে বিদেশিনী মহিলা তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামত আজও রহস্য—তিনি ধনতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না সমাজতন্ত্রে, নেহরুবাদী অর্থনীতির পক্ষপাতী না সংস্কারমুখী অর্থনীতি—কেউ জানে না। তিনি কোনও সাংবাদিক সম্মেলন করেন না, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শুধু লিখিত বা একতরফা বিবৃতির মাধ্যমে। আর ইউ.পি.এ-র প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিবিদ হিসেবে যে নাম কিনেছিলেন তা খুইয়েছেন গত এক বছরের মুদ্রাস্ফীতিতে। তা সত্ত্বেও ইউ.পি.এ. সরকার লেংড়ে লেংড়ে পাঁচ বছর চালিয়ে দিয়েছে এবং এই নির্বাচনে এঁরাই (এন ডি এ এবং ইউ পি এ) জনসাধারণের সামনে প্রধান প্রতিপক্ষদ্বয়।

প্রতি লোকসভা নির্বাচনের সময় কোনও না কোনও দল একটা 'তৃতীয় বিকল্পের' ধুয়ো তোলে—এবারও তুলেছে। এবারের প্রধান হোতা সিপিএম-এর প্রধান সম্পাদক এবং মুখপাত্র প্রকাশ কারাত। ইনি মূলত মালয়ালী হলেও মালয়ালম ভাষা ভালোভাবে বলতে পারেন না। ইনি এবং এঁর দোসর সীতারাম ইয়েচুরি (মূলত অন্ধ্রদেশীয়) নিজেদের রাজ্যে সম্পূর্ণ সমর্থনহীন হলেও, কেন্দ্রে বসে দল চালাচ্ছেন শুধু দুটো কারণে ঃ এঁরা সুদর্শন চেহারার অধিকারী এবং ইংরাজি-হিন্দী দুটো ভাষায়ই ভাল বলতে পারেন। এই কারণেই কেরল ও বাংলার তাবড় কমরেডরা নিজেদের রাজ্যে প্রবল প্রতিপত্তিশালী হলেও ইংরাজি ও হিন্দী বলতে না পারার ফলে এই দুই মূর্তির হুকুম তামিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এঁদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন বাংলার কমরেড সৈফুদ্দিন চৌধুরী—এঁরা সাত-তাড়াতাড়ি তাঁকে পার্টি থেকে তাড়িয়েছেন। যাই হোক, এবারও যে প্রকাশ কারাতের এই প্রকল্প ব্যর্থ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ কারাতের ও তাঁর পার্টির কপালে ঝুলছে সেই আগের মতো 'বাইরে থেকে' কংগ্রেসকে সমর্থন— যদি অবশ্য কংগ্রেস গতবারের মতো ঝোঁঝুল্যমান অবস্থায় পৌঁছায়। তা না হলে এঁদের ওই ত্রিশ-চল্লিশজন এম পি নিয়েই নখদন্তহীন বিরোধী ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

> **"মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা অতীতের ভুল বুঝবেন এবং হিন্দুর উপর অত্যাচারের প্রকাশ্য নিন্দা করবেন তাঁদের অবশ্যই কাছে টেনে নিতে হবে। কিন্তু সব বুঝে শুনে যদি কংগ্রেসী কেতায় "একবৃন্তে দুটি কুসুম" গোছের হাপু গাওয়া হয় (দুঃখের বিষয় রাজ্য বিজেপিতে এরকম মাঝে মাঝে হয়) তা হলে দল যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকবে।"**

ত্রিশ-চল্লিশজন কেন বলছি? বলছি তার কারণ, এবার নিঃসন্দেহে সিপিএম-এর সাংসদ সংখ্যা কমবে। কেরলে পিনারাই বিজয়ন এবং অচ্যুতানন্দন-এর মধ্যে যে বীভৎস লড়াই চলছে তার প্রভাব সেই রাজ্যের লোকসভা ভোটে পড়তে বাধ্য। আর পশ্চিমবঙ্গে? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএম যে খুন-ধর্ষণের খেলা দেখিয়েছে তাতে তাদের বর্তমান সাংসদ সংখ্যা (সিপিএম এবার ৪২, চার বামদলের মোট ৫৮) ধরে রাখা অসম্ভব। মোট বামফ্রন্টের সাংসদসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে নেমে এলেও আশ্চর্য হবো না।

কিন্তু পঁচিশ থেকে ত্রিশ মানেও তো পঞ্চাশ শতাংশের চেয়ে বেশি আসন। এবার বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে সিপিএম-এর যেরকম ল্যাজে-গোবরে অবস্থা হয়েছে তাতে তো আসন আরো অনেক কমা উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আজ্ঞে হ্যাঁ উচিত, কিন্তু এর পরেও কথা আছে, যার ফলে বামফ্রন্টের মোট আসনসংখ্যা পঁচিশের কম হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আরো কমলে, আরো অনেক কমলে, এই প্রবন্ধকারের চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। কিন্তু বাস্তবের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক্।

একথা সবাই জানেন যে যদিও বামফ্রন্টের ভোটের অঙ্ক এই রাজ্যে পঞ্চাশ শতাংশের চেয়ে একচুল বেশী। তা সত্ত্বেও গতবারের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস বেয়াল্লিশটি আসনের মধ্যে একচল্লিশটি পেয়েছিল, বিধানসভা নির্বাচনের পরে বুদ্ধদেব জাঁক করে বলেছিলেন ওরা পঁয়ত্রিশ, আমরা দুশো পঁয়ত্রিশ! এই বিবৃতির কারণ অবশ্যই বামবিরোধী জোট না হওয়া। এবার কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে জোট হওয়া নিয়ে প্রচুর জল্পনাকল্পনা চলছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত জোট হবে কি না সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। সন্দেহের কারণ দ্বিবিধ। কংগ্রেসের তরফে অন্যতম কারণ রাজ্য সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই ভদ্রলোক সিপিএম-এর পরম শুভানুধ্যায়ী তাতে কোনও সন্দেহ নেই— তার কারণও সুবোধ্য। সিপিএম-এর সাহায্য ছাড়া ইনি একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটেও জিততে পারবেন কি না সন্দেহ। তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হলে সিপিএম খুশী হবে না একথা অনস্বীকার্য এবং সিপিএম-কে চটাবার মতো কাজ প্রণববাবু কেন করবেন তা বোধগম্য হচ্ছে না।

কংগ্রেসের তরফে জোট না করার দ্বিতীয় লক্ষণ, সোনিয়ার আচরণ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে আজ যেভাবে চালানো হচ্ছে তাতে দেখে তো মনে হচ্ছে না এই পার্টির পশ্চিমবঙ্গে জিতবার কোনও ইচ্ছা আছে। প্রথমত, কংগ্রেসের আজকে প্রচন্ড নেতৃত্বের সংকট—প্রিয়বাবু জীবন্মৃত অবস্থায়, সুব্রত আবার তৃণমূলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন, সোমেন-সুদীপ ছেড়ে চলে গেছেন, দীপা, প্রদীপ বা মানসের সে সাধ্য আছে বলে মনে হয় না। তবু এঁরা কয়েকজন যখন আছেন, বা অন্য কোনও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা (যেমন অরুণাভ ঘোষ), তখন সোনিয়া তথা হাইকম্যান্ডের যদি জিতবার ইচ্ছা থাকত তাহলে এঁদের মধ্যে কাউকে কি প্রদেশের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল না? তা না দিয়ে দিলেন সেই প্রণব মুখোপাধ্যায়কে, যিনি বর্তমানে নিজেদের বিদেশ মন্ত্রক ছাড়াও অর্থমন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর কাজও অংশত দেখছেন। এইসব দেখে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দেখবার সময় প্রণববাবু কি দিনে পাঁচ মিনিটও পাবেন?

অবশ্যই পাবেন না। তাহলে কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে জেনে বুঝে দুর্বল করে রাখার অর্থ কী? অর্থ একটাই— সিপিএম-এর কাছে বার্তা পাঠানো যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে কখনোই তোমাদের পথের কাঁটা হতে দেব না—

(এরপর ৬ পাতায়)

৩০০ কোটির প্যাকেজ

(১ পাতার পর)

বেতনও এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার। এরা কোনও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে আসা শিক্ষক নয়। ফাজিল-কামিল ডিগ্রি নামে মাদ্রাসা যা শেখায়, তা কি একজন অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা এম এ, এম এস সি পাস প্রার্থীর সমতুল! কিন্তু সরকার ফাজিল-কামিলদেরও সাধারণ শিক্ষকদের সমান বেতনক্রম করে দিয়েছে। এজন্য সরকারি কোষাগারের কয়েক কোটি টাকা প্রতিবছর বেরিয়ে যাবে।

মুসলিমদের ঋণ দানেও সরকারি সাহায্য বাড়তি বরাদ্দ হয়েছে ২০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দটি পুরো মাত্রায় যে 'ডোল' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এই ধরনের ঋণ বিলি হয়, কিন্তু আদায় হয় না। গরীব মানুষের বাড়ি তৈরির জন্য সরকার এক হাজার কোটি টাকা খরচ করবে, তার মধ্যে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা খরচ হবে কেবলমাত্র মুসলমান গরীবদের জন্য। গরীবের বিচারও হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ করে। অর্থমন্ত্রী মুসলিমদের জন্য সরকারি কোষাগার কার্যত উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ একটি সরকারের মুসলিম তোষণের এই নমুনা!

দুর্নীতিকে ইস্যু করবে বিজেপি

(১ পাতার পর)

শাসন' দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে তার দল ঘোরতর বিরোধিতা করবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন নেতাদের দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকার নিন্দা করে তিনি নেতাদের উদ্দেশ্যে 'ইমেজ' পরিবর্তন করার আহ্বান জানান।

ইউপিএ'র 'আম আদমি' শ্লোগান ভাঁওতা মাত্র। আদবানীজী বলেন, ইউপিএ তার 'আম আদমি'দের জন্য যা কিছু করেছে বলে প্রচার করছে, কাজে তা অনেক কম। যদি ইউপিএ কিছু করে থাকতো তা হলে ১০০ কোটির দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা আরও ছ'কোটি বাড়তো না। সরকারি পরিসংখ্যানই একথা বলছে। বিজেপি তার নির্বাচনী প্রচারে বলেছে, দেশকে একটা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ প্রশাসন উপহার দিতে তারা বদ্ধপরিকর। বিজেপি-র আবেদন, ৭৭-এর ইমারজেন্সী পরবর্তী সময়ের মতো জনতা যেন কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিজেপি'র হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। দুর্নীতির মূল অনেক গভীরে গিয়ে প্রবেশ করেছে বলে আদবানীজী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনে পার্টি ও ব্যক্তি স্বার্থেও প্রচুর অঙ্কের আর্থিক কেলেঙ্কারী ইউপিএ-র আমলে ঘটেছে। ভোটপর্ব শেষ হয়ে গেলেই নির্বাচিত নেতারা বিভিন্ন অসাধু উপায়ে টাকা-পয়সা আত্মসাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। আমাদের দেশবাসীকে বিভিন্ন উন্নত দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং ভোটে অর্থব্যয়ের উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এটাই দুর্নীতি দূর করার একমাত্র উপায় বলে এনডিএ-তার প্রচার পর্বে তুলে ধরবে।

বিশ্ব প্রবীণ সঙ্ঘ সম্মেলন

জগদীশ গণচৌধুরী ।।নাগপুরে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী (৩১.১.২০০৯-৬.২.২০০৯) বিশ্ব প্রবীণ সঙ্ঘ সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় ৩৫টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সমবেত প্রতিনিধিদের বক্তব্য ছিল, প্রতিটি প্রাচীন পরম্পরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও সমগ্র জীবজগতের কল্যাণকামী। কোনও প্রাচীন পরম্পরাই আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী নয়। মানবজাতিকে পরস্পর বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করে না। অথচ কিছু অর্বাচীন মতবাদ নানা প্রকার রণধ্বনি দিয়ে শান্তিপ্রিয় প্রাচীন পরম্পরা সমূহকে মেরে-কেটে ছারখার করে চলেছে। সম্মেলনে প্রতিদিন সকালে প্রাচীন পরম্পরাসমূহের হোম, পূজা-পার্বন প্রদর্শিত হয়েছে। দুপুরের পর হতো প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা। সন্ধ্যায় প্রাচীন লোকসঙ্গীত, নাচ-গান। এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের ফল্গুধারা দূরকে নিকট করার যোগসূত্র বিশেষ।

কমরেডদের চিনছে মানুষ

(১ পাতার পর)

রাজনৈতিক সংঘর্ষের সেসব ঘটনা ঘটেছে তার নববই শতাংশই ঘটেছে 'কামিয়ে নাও' দলের সদস্য সমর্থকদের স্বার্থ সঙঘাতে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হচ্ছে সল্ট লেকের সিটি সেন্টারের বাইরে স্থানীয় সিপিএম প্রমোটার নেতার ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর সঙ্গে সিপিএমেরই শ্রমিক সংগঠন সিটুর জঙ্গি বাহিনীর সশস্ত্র লড়াই। জ্যোতিবাবুর ঠিকানা ইন্দিরা ভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সিপিএম আশ্রিত দুই পক্ষের সশস্ত্র লড়াই, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি সবই স্থানীয় মানুষ স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন কীভাবে কামিয়ে নাও পার্টির নেতারা এলাকা দখলে রাখতে খুন রাহাজানিতে পিছপা হয় না। এর প্রতিফলনই সম্প্রতি ভোটের বাক্সে পড়ছে। অনেকেই বলবেন, সিপিএমের অপশাসন, অত্যাচারের কয়েক দশক ধরেই চলছে। তার প্রতিফলন তো ২০০৬-এর বিধানসভার নির্বাচনেও তেমন দেখা যায়নি। হ্যাঁ, দেখা যায়নি স্পষ্টভাবে ভোটের ফলাফলে। কিন্তু অশনি সঙ্কেত ছিল। বিগত ২০০৪-এর লোকসভার নির্বাচনে সিপিএম ফলাফলের নিরিখে বিপুল সাফল্য পেলেও ভোটদাতাদের সমর্থনের হার মোটেই বৃদ্ধি পায়নি। বরং অধিকাংশ আসনেই চল্লিশ শতাংশের নিচে ভোট পেয়েও স্রেফ ভোট কাটাকাটিতে সিপিএম প্রার্থীরা জেতেন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হবে।) এই বিপদ বার্তা পেয়েও আলিমুদ্দিনের নেতাদের ঘুম ভাঙেনি। বোঝেননি যে জন সমর্থনের ভিতটি আলগা হচ্ছে। অথবা বুঝলেও এই অন্তিম সময়ে তাঁদের কিছু করার নেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের স্রষ্টাদের মরতে হচ্ছে তাঁদেরই তৈরি করা ঘাতক বাহিনীর হাতে। কামিয়ে নাও কমরেডেদের পার্টি থেকে উৎখাত করা এখন আর সম্ভব নয়। কারণ, তা করতে গেলে আলিমুদ্দিনে বাতি জ্বালার লোক পাওয়া যাবে না।

মুম্বই হামলাকারীদের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ৪০০ স্থানীয় বাংলাদেশী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের তদন্তে নেমে ভারতীয় গোয়েন্দারা সাহায্যকারী হিসেবে অনেক স্থানীয় বাংলাদেশীদের সন্ধান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এরকম নিখুঁত ছকে সুশিক্ষিত কমান্ডোদের সঙ্গে প্রায় তিন দিন রুদ্ধশ্বাস লড়াই স্থানীয় মদত ছাড়া সম্ভব ছিল না। ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ লস্কর-এ-তৈবা'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে তদন্তকারী গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। মুম্বাইয়ে হামলার সাত দিনের মধ্যেই জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দিতে গোয়েন্দা এজেন্সিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করে। উল্লেখ্য, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুম্বাই-এ হামলাকারীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের যোগাযোগ রয়েছে বলে যে অভিযোগ করেছিলেন, এই তদন্তে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন বড় শহর থেকে ইতিমধ্যে প্রায় চারশ'র মতো বাংলাদেশী মুসলমানকে হেফাজতে নিয়ে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন। গোয়েন্দারা পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী ইসলামি জেহাদীদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত নেটওয়ার্ককে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতেই এই উদ্যোগ।

গোয়েন্দাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্থানীয় বাংলাদেশীদের সাহায্যেই মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হানাদাররা তাদের নির্দিষ্ট টার্গেটে—বিশেষ করে মুম্বাইয়ে যে সব এলাকার বেশি সংখ্যায়—মুসলমানদের জাতশত্রু ইহুদি ও আমেরিকানরা বসবাস করেন তা জানতে পেরেছিল। গোয়েন্দা তদন্ত থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, বাংলাদেশী হুজি জঙ্গিরা এবং তথাকথিত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-র জেহাদিরা মুম্বাই-এ হামলাকারীদের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক সমর্থন দিয়েছে। তবেই পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-এ-তৈবা

মুম্বাইয়ে দুঃসাহসিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ করেছে এবং সফল হয়েছে। মুম্বাইকে টার্গেটের অন্যতম কারণ হল মুম্বাই ভারতের আর্থিক রাজধানী। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্তে সামনে এসেছে পাকিস্তানী জেহাদি—তোফাইল এবং আমজাদ এর নাম। এরা দু'জন মুম্বাইয়ে হামলার সময়েই স্যাটলাইট ফোনে করাচীতে যে নিয়মিত কথাবার্তা চালাত তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। তোফাইল ও আমজাদ পাকিস্তানে সুন্নী মুসলিম সন্ন্যাসী সংগঠন 'সিপাহ-এ-সাহাবা'-র সদস্য। সিপাহ-এ-সাহাবা পাকিস্তানকে শিয়া-মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে। সিপাহ-এ-সাহাবা ছাড়াও জমাত-উদ্-দাওয়া ও লস্কর-এর সম্মুখ সংগঠন হিসেবে কাজ করে। এসব খবরই জানা গিয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারী সূত্রে। সূত্রমতে লস্কর-এ-তৈবা-কে যে সব ব্যক্তি ও সংগঠন সাহায্য করেছে তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর দেশজুড়ে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তদন্তে জানা গেছে, শেখ মুস্তাফা আবু জাঈদ নামে আল কায়েদার উঁচুদরের কমান্ডারের দায়িত্বে ও সঞ্চালনে এ সময়ে জম্মু-কাশ্মীর এবং আফগানিস্তানে জেহাদী কাজকর্ম চলছে। জাঈদ আবার লস্কর-এ-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদ-এর ভারতে জেহাদি কাজ-কারবার চালানোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। যদিও গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে, আমেরিকার হাতে জাঈদ মারা পড়েছে। কিন্তু তাকে অনেক জায়গাতেই ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেছে। ভারতীয় গোয়েন্দারা মুম্বাই-হামলায় জাঈদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন। সেজন্য আরও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন বলে এক গোয়েন্দা অফিসার জানিয়েছেন। মুম্বাই হামলার সময় ভারত থেকে পাকিস্তানে যেসব ফোন করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের মুম্বাই আক্রমণে বাংলাদেশীদের জড়িত থাকা এবং ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করার বিষয়টা বোঝা গিয়েছে।

বাংলাদেশী জেহাদিরা পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদেরকে মূলত মুম্বাই, সুরাট, মুর্শিদাবাদ, কিশানগঞ্জ ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি এলাকায় হুজি ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন নামের আড়ালে সাহায্য করে চলেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যে চারশ'জন বাংলাদেশীকে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে বলে অনুমান।

গোয়েন্দারা সন্দেহজনক হাওলা-কারবারিদের, বুকিদের, অবৈধ মাদক দ্রব পাচারকারীদের দিকেও তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং তাদের কাজকর্মের গতি-প্রকৃতি, স্থানীয় যোগাযোগ ও সর্বোপরি আর্থিক স্রোতের উৎস সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে বলে গোয়েন্দাদের ধারণা।

অন্য রকম

ডাকবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পোস্ট অফিসের কাজের দুর্বলতার চিত্রটা আর পাঁচজনের মতো তাঁর কাছেও খুব পরিচিত। চিঠি হারিয়ে ফেলা, কিংবা ঠিক সময়ে তা বিলি না হওয়ার রেকর্ড

মহেন্দ্র বিনায়ক ভিচারে

পোস্ট অফিসের ক্ষেত্রে কোনও নতুন নয়। ডাক বিভাগের এই গড়িমসি থেকেই ভবিষ্যৎ গড়ার দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় পোস্ট অফিসের কাজে তিনি নিজেও খুশি ছিলেন না। মনে মনে ঠিকই করেছিলেন আদর্শ কুরিয়ার পরিষেবা খোলার কথা। নিজের ভাবনাকে বুড়ো হতে দেননি মহেন্দ্র বিনায়ক ভিচারে। মুম্বাইয়ের ৩৭ বছরের তরতাজা যুবক শুরু করলেন কুরিয়ার সার্ভিসের কাজ। শুধুমাত্র টাকার জন্য নয়, লোকের সুখ-দুঃখের খবর ঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়াটাই তাঁর কাছে বেশি জরুরি মনে হয়েছে।

অঢেল টাকা না থাকলেও, ছোট আকারেই শুরু করলেন কুরিয়ার। ঝাঁ-চকচকে অফিস না থাকলেও, নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষেবা দিতে গাফিলতি করেননি তিনি। বিনায়কের সমবয়সীরা যখন রকে বসে আড্ডা দেয়, এম-পি থ্রি শুনে সময় কাটায়, তখন বিনায়কের সময় নেই, অবসর নেই সে সবের। কাঁধে লাল ব্যাগটা গলিয়ে শুধু এই দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের খবরা-খবর। নিজেই বিলি করেছেন ভারি ভারি পার্সেল।

ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা ছোট থেকেই বিনায়ক সেরেছেন। শুধু দু'পয়সা ইনকাম নয়, লোকে যাতে সস্তায় কুরিয়ার করতে পারে সেদিকেও নজর রেখেছেন বিনায়ক। মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে সারা মাস কুরিয়ার পরিষেবা দেওয়ার মতো ব্যবস্থাও তাঁরই মাথায় প্রথম আসে।

বিনায়কের 'ভিচারে কুরিয়ার সার্ভিস'-এ সাধারণ মানুষও উপকৃত। কম খরচে ভালো পরিষেবার জন্য তারাও বিনায়কের কাছেই ছুটে আসেন। মুম্বইয়ে কুরিয়ারের অভাব নেই। অভাব নেই পোস্ট অফিসেরও। তবে বিনায়কের অভাব রয়েছে। তাই একটু বেশি হেঁটেও অনেকে তাঁর কাছেই আসেন।

বিনায়ক তাঁর লক্ষ্য পূরণে অনেকটাই সফল। একদিন নিজের হাতেই সবকিছু করেছেন। এখনও করেন। কিন্তু তিনি আজ একা নন। তাঁরই কুরিয়ার অফিসে অনেকে চাকরি করছেন। ভালো বেতনও পান তারা। বিনায়কের ইচ্ছা, তাঁর কুরিয়ার সার্ভিস যেন পোস্ট অফিসের একটা জায়গা দখল করতে পারে। তাঁর স্বপ্ন পূরণে তিনি আশাবাদী। তাঁর কাছে এটা শুধু ব্যবসা নয়, সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কিছু করতে পেরে সে নিজেও গর্বিত।

এবারের লোকসভা নির্বাচন

(৩ পাতার পর)

পরিবর্তে কেন্দ্রে আমরা বিপদে পড়লে তোমরা আমাদের বাঁচাবে। যদি এই অনুমান ঠিক হয় তাহলে কি কংগ্রেস-তৃণমূলে জোট হতে পারে?

জিনিসটা অন্যভাবেও দেখা যায়। সিপিএম একটি সংঘবদ্ধ, সুসমঞ্জস দল, তাদের কথার দাম আছে (তারা আমাদের যতই অপছন্দ হোক্ না কেন)। অপরপক্ষে তৃণমূল একটি বিশৃঙ্খল দল, এবং এক নেত্রীর খেয়ালে তা চলে। এই দুটোর মধ্যে কোনটার সখ্যতা কংগ্রেস চাইবে? নিশ্চয়ই সিপিএম!

কংগ্রেস-তৃণমূলে জোট না হবার তৃতীয় কারণ তৃণমূলে নিহিত—বা বলা উচিত তার নেত্রীর মানসিকতায় নিহিত। আসন বাঁটোয়ারার সময় নেত্রী কংগ্রেসকে 'মজা টের পাইয়ে' দেবেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় নেত্রী বিজেপির সঙ্গে এই একরকম ব্যবহার করেছিলেন। তফাতের মধ্যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজেপির চাইতে তৃণমূল নেত্রীকে আরো অনেক ভাল করে চেনেন (একই ঝাড়ের বাঁশ তো!)। তাই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বামফ্রন্টকে হারাবার তাগিদে নেত্রীর বাঁটোয়ারা যেভাবে মেনে নিয়েছিলেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেরকম করবেন বলে মনে হয় না। তাহলে কী করে জোট হয়?

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের আর এক সমস্যা, কংগ্রেস চায় তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করুন যে তিনি নির্বাচনের পরেও কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকবেন (অর্থাৎ ২০০২ সালের মতো বিজেপির কাছে চলে যাবেন না)। আর তৃণমূল নেত্রী বলছেন, এই প্রশ্ন অবান্তর। কারণ আমি তো বলছিই যে এটা ধর্মনিরপেক্ষ জোট (অর্থাৎ বিজেপি বাদ, কারণ তারা মুসলমানদের কোনও অতিরিক্ত সুবিধা দেবে না)। কিন্তু অবান্তর বললেই কি অবান্তর হয়ে যায়? মমতা যে প্রয়োজনবোধে নির্বাচনের পরে আবার বিজেপির সঙ্গে জোট করার স্বাধীনতা রাখতে চাইছেন তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, যদি তাঁর অতীতের পেন্ডুলাম-রাজনীতি মাথায় রাখা যায়। কিন্তু কংগ্রেস তা মানবে কেন? বিশেষ করে যেখানে জোট না করার সপক্ষে কংগ্রেসের প্রভূত কারণ আছে!

তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির জোট হবার আর আশা নেই বললেই হয়। তার কারণও নেত্রী—বস্তুত তৃণমূল পার্টি তার নেত্রী থেকে আলাদা কিছু নয়। ইনি বিশেষ কারুর পরামর্শ শোনেন বলে খ্যাতি নেই—এক এক সময় যে ঝোঁকটা ওঠে সেটাই করেন। ওঁর বর্তমান ঝোঁক থেকে সুকুমার রায়ের অমর কবিতার বই 'আবোল-তাবোল'-এর কথা মনে পড়ে। খুড়োর কাঁধে কল লাগানো আছে, সেই কলের মাথায়, হাতের নাগালের ঠিক বাইরে, লোভনীয়তম খাদ্য ঝুলছে—যেমনি খুড়ো সেটা ধরতে যাবেন অমনি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে—আর "এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে/উৎসাহেতে হুঁশ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।" অর্থাৎ খুড়ো ছুটছেন, আর খুড়োর সামনে খুড়োর খাদ্যও সমান গতিতে ছুটছে।

তৃণমূল নেত্রীও বর্তমানে খুড়োর কলের কবলে পড়েছেন। তফাতের মধ্যে কলের মাথায় খাদ্য ঝুলছে না, যেটা ঝুলছে তার নাম মুসলমানের ভোট। এই মুসলমানের ভোটের লোভে নেত্রী এখন এমন উন্মত্ত যে নন্দরাম মার্কেটের অগ্নিকান্ডে উৎখাত ব্যবসায়ীদের একটি সভায় পর্যন্ত যেতে যেতে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কারণ? কারণ, সেই মঞ্চে বসে ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিংহ—এক মঞ্চে বিজেপি নেতার সঙ্গে বসলে মুসলমান ভোট যদি চোট খায়—তাই গাড়ি ঘুরিয়ে পলায়ন!

অথচ ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গে যৌথভাবে তিনটে নির্বাচন লড়েছেন। এরকম শুচিবায়ুগ্রস্ত, পেন্ডুলাম মার্কা রাজনীতি করে কি কোথাও পৌঁছানো সম্ভব? এই অবস্থা দেখেই ইদানীংকার এক অজ্ঞাতনামা কবি কবিগুরুর প্যারডি করে লিখেছেন "এতো বড় রঙ্গ জাদু এতো বড় রঙ্গ/চার মিঠা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ/মিঠা চিনি গুড় মিঠা হাজার টাকার নোট/সবার চেয়ে বেশি মিঠা মুসলমানের ভোট।"

নিজের দল চালানোতে তৃণমূল নেত্রী যে মানসিক গঠন দেখিয়েছেন তারও বিলক্ষণ প্রভাব পড়বে রাজ্য-রাজনীতিতে। ওই বিষয়ে লাখ কথার এক কথা বলেছিলেন সুব্রত, যখন শেষ বার তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে যান। আগে বলা 'বেদের মেয়ে জোস্না' ম্লান হয়ে যায় সেই উক্তিতে, যাতে সুব্রত বলেছিলেন, মমতার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য পরশ্রীকাতরতা। এই কথা সুব্রত বলেছিলেন কারণ, মেয়র হিসেবে সুব্রতর সুনাম হওয়ায় অসূয়াগ্রস্ত হয়ে মমতা তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। এরই ফলে তাঁর নিজের দলের মধ্যে কোনও গণতন্ত্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ করবেন না নেত্রী। আশঙ্কা, যদি দলের কর্ত্রীত্ব ওঁর হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে যায়। রাজ্যের মানুষের পোড়া কপাল—ভাগ্য যাঁর হাতে এই খুনী-স্বৈরাচারী সিপিএম-এর বিরোধিতা করার পতাকা অর্পণ করেছিল, তিনি দল চালাবার ব্যাপারে অথবা জোট করার ব্যাপারে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিতে পারলেন না। "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বাহিবারে দাও শক্তি", পশ্চিমবঙ্গের বামবিরোধী মানুষের এই প্রার্থনা মিথ্যে হয়ে গেল।

প্রসঙ্গত, এরকম মন্তব্য আমি আগেও একবার 'স্বস্তিকা'-র পাতায় করেছিলাম—যার ফলে স্বস্তিকার জনৈক পাঠক (নামটা মনে নেই) ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, মমতার দলের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করার অধিকার আমার নেই। সবিনয়ে জানাই, আমি ভিন্নমত পোষণ করি। কোনও রাজনৈতিক মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কখনো সমালোচনার ঊর্ধে হতে পারে না—মোহনদাস গান্ধীরও নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও নয়।

বিজেপি-তৃণমূলে জোট হবে না, কংগ্রেস-তৃণমূলে হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না—নাও হতে পারে। এই জোট বিমুখতার ব্যাপারে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মনোভাব নিয়ে আলোচনা হল। বি জে পি-র পরিস্থিতিটা এক্ষেত্রে কী?

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি রাজনৈতিক কুশীলবদের মধ্যে প্রধান না হলেও যে স্থান অধিকার করে আছে সেটা আদৌ ফেলে দেবার মতো নয়। সাধারণভাবে জোট না হলে বিজেপির ভোটের অঙ্ক পাঁচ-ছয় শতাংশের মতো থাকে, জোট হলে এবং যথেষ্ট সংখ্যক আসন লড়লে (দুটোই প্রয়োজন) সেটা আট-দশ শতাংশের মতো ওঠে। এই ভোটের অঙ্কগুলি কিন্তু কাটাকাটির খেলায়, মারাত্মক। বহু তৃণমূল বা কংগ্রেস প্রার্থী হেরে যেতে পারেন এই কাটাকাটিতে। ১৯৯১ সালে বিজেপির ভোটের অঙ্ক এগারো শতাংশে উঠেছিল, কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনেই, এবং এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জন্ম, ধরা যেতে পারে, রামমন্দির আন্দোলনের সময়। অর্থাৎ ১৯৮৮ সাল নাগাদ, কুড়ি বছর আগে। সে তুলনায় কংগ্রেস আছে ১৮৮৫ থেকে, কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯২০ থেকে। একটা রাজনৈতিক মতের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, একটা দলের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার জন্য একটা ন্যূনতম সময় দরকার, তার আগে বিজেপি, কংগ্রেসী, কম্যুনিস্টদের ধরতে পারবে না। কিন্তু সময় হলে ঠিকই পারবে। তার কারণ খুব সরল। ভারতবর্ষে বাঙালি হিন্দুর চেয়ে বেশি ইসলামি মৌলবাদী অত্যাচারের বলি কেউ হয়নি—এবং এর বিরোধিতা করেছে, এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছে, একমাত্র বিজেপি। অবশ্য কংগ্রেসী কম্যুনিস্টরা এটাকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে যথাসম্ভব চেপে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে, এতদিন সফলও হয়েছে—কিন্তু শেষপর্যন্ত সত্য প্রকাশ পাবেই এবং তার জন্য বিজেপি সমর্থন পাবেই। কিন্তু এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিরও কিছু কর্তব্য আছে। নববইয়ের দশকে যা ছিল বিজেপির গর্বের বিষয় "সহী দিশা, স্পষ্ট নীতি" তাতে দলকে অটুট ও অটল থাকতে হবে। মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা অতীতের ভুল বুঝবেন এবং হিন্দুর উপর অত্যাচারের প্রকাশ্য নিন্দা করবেন তাঁদের অবশ্যই কাছে টেনে নিতে হবে। কিন্তু সব বুঝে শুনে যদি কংগ্রেসী কেতায় "একবৃন্তে দুটি কুসুম" গোছের হাপু গাওয়া হয় (দুঃখের বিষয় রাজ্য বিজেপিতে এরকম মাঝে মাঝে হয়।) তা হলে দল যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকবে।

তাহলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল?

সামনে নির্বাচন—একদিকে সিপিএম, অন্যদিকে তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি।

বামবিরোধী জোট হলে খুব ভাল—কিন্তু হবার সম্ভাবনা কতদূর বোঝা যাচ্ছে না।

কংগ্রেস সিপিএম-এর সঙ্গে লড়াই করতে চায় না, করবে না।

তৃণমূল লড়াই করে পারবে না।

বিজেপি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ততদিন আমাদের কপালে এই লাল কুশাসনই বোধ হয় লেখা আছে।

সাংসদদের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেও চুপ করেই থাকতে হয়েছে স্পীকারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ছোটবেলায় ক্লাস(মের 'ফার্স্ট বয়' থেকে শেষ বেঞ্চে বসা ছেলেটিরও দু'এক ঘা বেত মেরে সোজা হওয়ার গল্প আছে। আজকের 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের' 'সংসদ' নামের স্কুলে পড়ুয়াদের মাস্টারমশাই শাসন করেছেন—এমন দৃশ্য টিভি-র পর্দায় বা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মাঝে মধ্যেই চোখে পড়ে। ফল অবশ্য ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা কম। অন্যতম কারণ বৃহত্তম গণতন্ত্রের ক্লাস(মের বেশিরভাগ ছাত্রদের হাড়গুলো বুড়ো হয়ে গিয়েছে। স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ পার্লামেন্টের হেডমাস্টার একটি বিশেষ প্রজাতির মানুষের আচরণকে ঘসে মেজে কিছু স্বভাব বদলাতে চাইছেন। এই বিশেষ প্রয়াসের ফলাফল ঃ 'লোকসভা' নামের সরকারি চ্যানেলে সাম্প্রতিক অতীতের যে কোনও ওয়ার্কিং ডে'র জিরো আওয়ারের হৈ চৈ দাপাদাপির দৃশ্য।

এবার বোধহয় হেডমাস্টারের সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। হাতে ছড়ি না থাকলেও রাজনীতির কাছে বিত্রি(ত না হয়ে যাওয়া শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যাও তো কম নয়। তাই লোকসভার অধ্য(সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সাম্প্রতিক বেশ কিছু অধিবেশনে মুখ খুলতে বাধ্য হতে হয়েছে। প্রায় সমস্ত পার্টির এম.পি-দের-ই অবাধ্য আচরণ মাননীয় স্পীকারের ধৈর্য্যের সীমা অতিত্র(ম করে। 'একটি দুষ্ট প্রাণী'র থেকে শূন্য পার্লামেন্ট অনেক ভালো ভেবেই বোধ হয় সোমনাথবাবু বলতে বাধ্য হয়েছেন, সাংসদরা ভোটে হারলে তাদের শি(া হবে। মানুষের টাকা নিয়ে মানুষেরই জন্য কাজ না করায় তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। অধ্য(আ(প করে বলেছেন, এই ধরনের শি(ত জনগণের প্রতিনিধিদের অবাধ্য ব্যবহার দেখে তিনি খুবই হতাশ, মর্মাহত। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার এল.টি.টি.ই-র ঘটনায় ডি.এম.কে. বা এম.ডি.এম.কে-র সাংসদদের আচরণে সোমনাথবাবু অত্যন্ত (ুব্ধ। সাংসদদের নিয়ন্ত্রণে অধ্যে(র শাসনের একটা খসড়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংসদকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঃ এদিন লোকসভায় কোশ্চেন আওয়ারে সাংসদরা উত্তেজিত হয়ে (োভ প্রকাশ করলে অধ্য(বলেন, "জনগণের টাকার একটা পয়সাও আপনাদের দেওয়া উচিত নয়। সংসদের এই অধিবেশন স্থগিত হয়ে যাওয়া উচিত। আপনাদের ভাতা দেওয়ার মতো অপ্রয়োজনীয় কাজে আম-জনতার পয়সা নষ্ট না হওয়াই ভালো!"

১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঃ সোমনাথবাবু অত্যন্ত ত্রু(দ্ধ হয়ে বলেন, "আপনারা গত চার বছরে এই পার্লামেন্টটাকে শেষ করে দিয়েছেন। তার থেকে বরং সংসদের এই অধিবেশনেই অকাল-বলি দিয়ে দিন আপনারা। আমার মাথায় ঢোকে না কেন এই সংসদ, কেনই বা "ভোট পদ্ধতি।"

১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঃ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার জয়েন্ট সেশন সম্বন্ধে বলেন, "আমি নাম উল্লেখ করছি না, তবে যা ঘটছে তা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, ভয়ঙ্কর।"

২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ ঃ ৭৩ তম লেজিসলেটিভ্ বডি'র সভাপতিদের সম্মেলনে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই (বিধানসভা'র জিরো আওয়ারে হয়রানি) অধিবেশন সব থেকে অবাধ্য বিধায়কদের অধিবেশনে পরিণত হয়েছে।"

২২ জুলাই ২০০৮ ঃ সোমনাথবাবুর বক্ত(ব্য— সংসদের অধিবেশনের চূড়ান্ত অধঃপতিত রূপ দেখা যাচ্ছে।

৩০ এপ্রিল ২০০৮ ঃ 'জিরো আওয়ার' হল পার্লামেন্টের 'টর্চার আওয়ার'—স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আ(প।

২৪ আগষ্ট ২০০৬ ঃ সংবিধান সম্বন্ধে একটি বক্ত(ব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের সকলকেই পার্লামেন্ট চলাকালীন নীতিবি(দ্ধ ও রূঢ় আচরণ বন্ধ করতে সহযোগিতা করা উচিত।"

'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে'র সাংসদরা সংসদে টাকার বান্ডিল নিয়ে রাজনীতি করে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে' নাম তোলার (মতা রাখেন। সেই সংসদের অধ্য(কে 'শাসন' করার জন্য (মাও চাইতে হয়। এখন আম-জনতা তাদের প্রতিনিধিদের 'সংসদ স্কুল থেকে তুলে এনে আবার একবার 'কিন্ডারগার্ডেন'গুলোতে ভর্তি করলেই ভালো করবেন।

'প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা' নির্বাচনে তেমন প্রভাব ফেলছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ক্ষমতায় থাকার ফলে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে যে দুর্বলতা বা স্বৈরাচারী মানসিকতা গড়ে ওঠে, যেমনটা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় রয়েছে, অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এমন সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি দুটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে এমনই ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদের মতে, গত পাঁচ বছরের রাজনীতিতে এই প্রথমবার এটা হতে চলেছে। ক্ষমতাসীন থাকার ফলে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে যেখানে দুর্বলতার চাপ ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত দেখা যায়, এবারের নির্বাচনে সেই সম্ভাবনা নেমে ৪৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যা ইতিবাচক। লোকসভা নির্বাচনে এটা বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

শিবরাজ সিং চৌহান

রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালের ভোটে মধ্যপ্রদেশ সরকার পুনর্বার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান জনগণের রায়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। একই চিত্র ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। দিল্লীতে মসনদে কংগ্রেস পুনরায় বসেছে। যদিও বিজেপির আসন আগের থেকে বেড়েছে।

ডঃ রমণ সিং

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদব তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন, ১৯৮৯ থেকে ২০০৯-এ রাজনৈতিক ইতিহাসের চালচিত্রটা একটু অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। মসনদে থাকার ফলে যে দুর্বলতা শাসকের মধ্যে ৬২ শতাংশ দেখা যেত, এখন তা কমেছে। ৪৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সব রাজনৈতিক দলের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন।

শীলা দীক্ষিত

এর কারণ কী? মূলত রাজনীতিকদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনা, একাধিক পার্টির উপস্থিতি ও প্রতিযোগিতার জন্যই এরকম দেখা যাচ্ছে বলে শ্রীযাদব মনে করেন।

২০০৮ সালের মধ্যপ্রদেশ, ২০০৭-এর গুজরাট, ২০০৪ সালে ওড়িশায় ক্ষমতাসীন দলই আবার জনাদেশে ফিরে এসেছে। একই চিত্র অবশ্য মহারাষ্ট্রে, দিল্লীতেও দেখা গেছে। তবে সেখানে বিরোধীরা আগের থেকে ভালো ফল করেছে।

রাজনীতির পার্টি-গণিতের এই ধারা প্রথম দেখা যাচ্ছে। এর ফলে আগামী লোকসভা ভোটের লড়াইটা আরও কঠিন বলেই অনেকে মনে করছেন।

মাওবাদী প্রভাব বাড়ছে মহারাষ্ট্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মহারাষ্ট্রেও মাওবাদীদের উপদ্রব ক্রমশ বাড়ছে। মহারাষ্ট্র পুলিশও মাওবাদী উপদ্রবে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। মাওবাদীরা গত বছরের প্রথম দিকে ও চলতি বছরের শুরুতেই বড় ধরনের আক্রমণ চালিয়েছে। চলতি বছরের শুরুতেই মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে এক সাব ইন্সপেক্টরসহ ১৫ জন পুলিশকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। মূলত মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড় সীমান্তেই মাওবাদীদের প্রভাব বাড়ছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। সীমান্তের গ্রামগুলিতে পুলিশ নজরদারি জারি রেখেছে। পুলিশী সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও গত বছরের জানুয়ারি মাসে একটি রোডরোলার ও ট্রাক্টর উড়িয়ে দিয়েছিল তারা। এধরনের ঘটনা আবার ঘটতে পারে বলে পুলিশ মনে করছে।

এদিকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুলিশের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অস্ত্রের অভাবেই ১৫ জন পুলিশকর্মী মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টি নক্সাল অপারেশনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে একটি হেলিকপ্টার চেয়ে আসলেও তা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজ্যে মাওবাদীদের প্রভাব দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

কৃষ্ণবিরহী গৌর, গৌর বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া

ভাবনার দ্বিভুজ

গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য

নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ।

প্রথম চিত্র

স্থান—কাশীমিশ্রালয়, নীলাচল

কাল—ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক

মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব কাশী মিশ্রের গৃহের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। ওড়িয়া ভাষায় যার নাম ''গম্ভীরা''। এখন সেখানে থাকেন এক অত্যদ্ভুৎ সন্ন্যাসী। হেমবরণ এই সন্ন্যাসীকে ঘিরে কত জল্পনা ; কতই না কিংবদন্তী! কে এই সন্ন্যাসী? পরিধেয় বসনে ভারতবর্ষের সনাতন দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মনে হলেও ব্যবহারে তাঁকে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বলে চেনা যায় না। অনুক্ষণ চোখে জলের ধারা, মুখে আর্তিভরা কৃষ্ণনাম, দেহ রোমাঞ্চি ত। কখনও বা থর থর করে কাঁপে সর্ব অঙ্গ, ধরে রাখা যায় না। বাত্যাহত কদলীর মত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয় সুদীর্ঘ তনু। সাত্ত্বিকবিকারে বিকৃত দেহকে চিনতে পারেন না পরিচিতেরা। কিন্তু কী আশ্চর্য! কৃষ্ণনাম কানে যেতেই পরিবর্তন ঘটে অচেতন দেহে। হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, সর্ব অঙ্গে আসে চঞ্চ লতা, আশ্বস্ত হন সবাই। একই অবস্থা দিনের পর দিন। একই ব্যাকুলতা রাত্রির পর রাত্রি! দিনে যদি বাহ্য-আবেশ আসে, গভীর নিশীথে আসে ভয় জাগানো বিরহ যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণার দর্শক যাঁরা তাঁরা সুউচ্চ ভাবস্তরের হলেও ভয় আসে তাঁদের প্রাণে—কী জানি কী হয়! বিরহীর দশদশা শাস্ত্রে তাঁরা জেনেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন এই সন্ন্যাসীর বিরহদশায় তাঁরা প্রত্যেকটিকে। কখনও দেখেছেন প্রাণকোটি প্রিয়তমের চিন্তায় স্তব্ধ। দেখেছেন নিদ্রাহীন রাত্রি কেটে যাচ্ছে প্রিয়বিয়োগ ব্যাকুলতায়। অনুভব করছেন তাঁরা প্রতিমুহূর্তের উদ্বেগকে। উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত বিরহীর আর্ত-প্রলাপ ভারী করে তুলছে গম্ভীরার প্রকোষ্ঠকে। দিনে দিনে কৃশতা প্রাপ্ত দেহের দিকে ঘনিষ্ঠরা তাকাতে ভয় পান। দেহ সংস্কারশূন্য, বড় মলিন। অন্তরের নিদারুণ ব্যথা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে অহরহ। অন্তর্মুখীনতা বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করে তুলেছে তাঁকে। এ কী জাতীয় প্রলাপ! সীমাহীন বিরহজ্বালায় জর্জরিত তনু। সহসা দেখলে মনে হয় শত সহস্র বিষাক্ত দ্বিজিহ্বের বিষের জ্বালায় দেহ ক্লিষ্ট। নিদান শাস্ত্রে এ ব্যাধির কোন চিকিৎসা নেই, নেই কোন সান্ত্বনা। কখনও বা উন্মত্ততা পেয়ে বসে গম্ভীর প্রকৃতির সন্ন্যাসীকে। ব্যাকুল হয়ে ছুটে যান ইতস্তত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মোহদশায়। মূর্চ্ছা যান কখনও কখনও গম্ভীরায়। কখনও বা জগন্নাথের সিংহদ্বারে, কখনও বা নীলাচলের ইতস্তত। তবে কি শেষ দশা দশমীকে দেখতে হবে। সত্রাসে তাকান একে অন্যের দিকে। না, মোহদশায় কৃষ্ণনাম যেতেই মূর্চ্ছা ভাঙে। নাড়ী পর্যন্ত পাওয়া যায় না এ সময়। হৃদ্‌পিন্ডের গতি স্তব্ধ প্রায়। না, আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় না। আবার চাঞ্চ ল্য আসে দেহে। দেহের সন্ধিস্থান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও অলৌকিক ভাবে আবার তা যুক্ত হয়ে যায়। বীভৎস, বিকৃত দেহটিতে আবার আসে লাবণ্যময় কমনীয়তা।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে নীলাচলের গম্ভীরায় এই অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল বারোটি বছর ধরে। সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে নদীয়ার নিমাই আশ্রয় নিয়েছিলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব কাশী মিশ্রের আলয়ে। সেই গৃহের ভিতরের একটি ছোট গৃহে, সন্ন্যাসীর কেটেছিল বারোটি বছর। এ এক অনির্বচনীয় লীলা!! ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকগণ যুগ যুগ ধরে যে আনন্দকে অনুসন্ধান করেছিলেন অথচ খুঁজে পাননি, সেই অনুসন্ধেয় রসকে জগতে প্রকাশ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন রসস্বরূপ স্বয়ং। এ অবতরণের তুলনা নাই। বেদাদি শাস্ত্রবিধির জাল বুনে, নিষেধের প্রাচীর তুলে যুগ-যুগান্তর ধরে যে অধরাকে ধরবার চেষ্টা নিয়েছেন সেই অধরা এলেন ধরা দিতে নবদ্বীপ লীলায়। রসের চরম অবস্থা, রসস্বরূপ, রসব্রহ্মের অভিনব রূপকে প্রত্যক্ষ করালেন শ্রীচৈতন্য ; যে রস এতকাল ছিল রহস্যের খাসমহলে মুখ লুকিয়ে। আসলে রসের আস্বাদনকে বুঝতে পারলেও তার প্রকৃত পরিচয় ছিল আমাদের অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাত রহস্য ধরা দিল গম্ভীরার প্রায়ান্ধকার কক্ষে রসব্রহ্মের অভিনব লীলায়। যে লীলার নায়ক রাধাভাব-কান্তিধর-শ্রীগৌরহরি। শ্রুতি যাকে বলেছেন 'রস', সেই রস এলেন মানুষের কাছে নেমে আপন ঈশ্বরতত্ত্বকে লুকিয়ে আস্বাদকের ভূমিকায়। তাইতো সহজ হল অলৌকিক রসানুভূতি। কি চমৎকারিতা আছে রসের মধ্যে তা বোঝা গেল সমুদ্রগভীর চৈতন্যের লীলায়। বেদান্তের সুগম্ভীর ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত চিনিয়েছিলেন যে রসকে, বিষয় আশ্রয়রূপে দ্বৈত সত্ত্বায় তারই আস্বাদন আমরা পেলাম নিতান্ত অনধিকারী হয়ে। তাই এ বিরহচিত্র সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মূলতত্ত্ব তো রসচর্বণায় নিহিত। সে রসচর্বণা আবার প্রকাশ পেয়েছে বিরহ আধারে। সেই আধারটির পরিচয় আমরা পেলাম ষোড়শ শতাব্দীর লোকাতীত লীলাবিলাসে—'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'—রসশাস্ত্রের সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার হল গম্ভীরালীলায় চৈতন্যের বিরহব্যাকুল দিব্যমূর্তিতে।

দ্বিতীয় চিত্র

স্থান—নবদ্বীপ

কাল—ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক

নিমাইশূন্য নদীয়া। বেশ কয়েক বছর হল নবদ্বীপ ছেড়ে নদীয়ার নিমাই শচীনন্দন সন্ন্যাসী হয়ে নীলাচলবাসী। নবদ্বীপ অন্ধকার। ভক্তবৃন্দ অনেকেই আর নবদ্বীপে নেই। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যাঁরা তাঁরাই আছেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে যাঁরা প্রধান ভূমিকায় ছিলেন সংকীর্তনে, যাঁদের দেখা যেত সর্বদাই, তাঁরা অনেকেই নবদ্বীপ ছেড়েছেন। কারণ ''যে দেশে গৌর নাই সে দেশে না রব।'' নিত্যানন্দ এসেছিলেন নীলাচল থেকে একবার। নদীয়ার মানুষের কাছে শুনিয়েছিলেন গৌরববার্তা। সে তো অনেক পুরনো কথা। ইতিমধ্যে নীলাচলের সংবাদ দীর্ঘদিন আসেনি বললেই চলে। বৎসরান্তে যাঁরা নীলাচলে যান তাঁরাও নবদ্বীপ হয়ে যান না ; যান কুমারহট্ট হয়ে। কাজেই নবদ্বীপের কাছে নীলাচল আজ অনেক দূর। নীলাচল আজ বহু দূরই বটে !!

বিরহিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হয় যেন সেসব দিনের কথা স্বপ্নের মত। নবদ্বীপের পথে অজস্র মানুষের ভীড়ে সংকীর্তনরত সে মূর্তিকে কতদিন স্বপ্নে দেখেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। কীর্তনান্তে যখন গৃহে আসতেন, স্বামীর পা ধুইয়ে দিতেন প্রিয়াজী। শেষে আঁচল দিয়ে দুখানি রাতুল চরণ মুছিয়ে সুগভীর শ্রদ্ধায় হতেন আনতা। পিঠে আলতোভাবে যখন হাতের ছোঁয়া লাগত, সম্বিৎ ফিরত। প্রণাম সেরে উঠে ছুটে চলে যেতেন সামনে থেকে। পিছনে আহ্বান কানে বাজতো, প্রিয়া, কি হচ্ছে? অমন করে ছুটে চলে গেলে যে? সেসব দিন এখন স্বপ্নবৎ মনে হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার দীর্ঘযামা রজনীতে রাতজাগা পাখীটা যখন তারস্বরে ডেকে চলে, প্রিয়াজী তখন শয্যা ছেড়ে বাইরে আসেন। পশ্চিম আকাশে জ্বল জ্বল করে শুকতারা। তারার আলোর দিকে তাকিয়ে প্রিয়াজী চুপ করে থাকেন অনেকক্ষণ, দুটি চোখ ভরে ধারা নামে। কপোল বেয়ে গড়িয়ে যায়।

রাত শেষ হয় অজ্ঞাতে। মানুষ তখনও কেউ জাগেনি নবদ্বীপের, অন্ধকারে স্নান সেরে গৃহে প্রবেশ করেন গৌর-গৃহিণী। অনেকদিন ধরে প্রিয়তমের পাদুকা অর্চনা করে এসেছেন। বড় ইচ্ছা হয়েছিল একটি মূর্তি নির্মাণ করবেন আরাধ্যের। ভক্তের কাছে অভিলাষ জানাতেই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। সেই মূর্তির অর্চনায় আর সেবায় এখন প্রাণ মন সব ঢেলে দিয়েছেন সনাতন তনয়া বিষ্ণুপ্রিয়া। বাইরের কেউ আর সাড়া পায় না ধ্যানমগ্ন তাপসীর। নিজের হাতে ফুল তুলে তুলসী চয়ন করে সেবা করে

(এরপর ১৩ পাতায়)

অবতীর্ণ হলে তুমি জীব উদ্ধার লাগি..

সোমনাথ নন্দী

আহা, কী অপরূপ সুন্দর মানুষ। কী অসাধারণ প্রেমার্তি। রাতভোর বিরামহীন ভাবে জপে চলেছেন কেবল—একনাম, একমন্ত্র। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম। কখনও বা ককিয়ে উঠছেন আকুল কান্নায়। বলে যাচ্ছেন—অয়ি দিনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদা বলোক্যসে/ হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং। ওগো দীনদয়াল প্রভু, মথুরানাথ তুমি। কবে দেবে দেখা। ওগো প্রিয় তোমার অদর্শনে হৃদয় যে কাতর। কী-কী করি আমি।

কনক গৌর অঙ্গকান্তি। অরুণাভ দ্যুতি তায়। সারা শরীরে যেন লাবণ্যের ঢল। রাধাভাব সমন্বিত যেন। আকর্ণ বিস্তৃত আঁখিপল্লব অর্ধনিমীলিত। দৃষ্টি যেন সদা মধুকরের মতো মত্ত কৃষ্ণরূপ মকরন্দ পানে। শরীরে থেকে থেকে স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলকাদির তীব্রস্ফূর্তি। সর্বকারণকারণ অনাদিরাদি গোবিন্দের ইনিই কি সেই নবরূপাধার। কলিহত জীব উদ্ধারিতে এঁরই কি আবির্ভাব। শ্রীমদভাগবতে কি দেওয়া হয়েছে এঁরই অবতারণের পূর্বাভাস—**কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষ কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ ম/ যজ্ঞৈ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধ সঃ (ভা ১১/৫/২৯)।** ভাগবত বা বলি কেন। মহাভারতে সহস্রনাম স্তোত্রেও তো বলা হয়েছে কলি পাবনাতারের রূপাকৃতি—**সুবর্ণবর্ণো হেমঙ্গো বরাঙ্গশ্চ নাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়নঃ।** হেমাঙ্গ শরীরে উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রভা। সুঠাম তনু। চন্দন চর্চিত দুই বাহু। সন্ন্যাসী। শান্ত সমদৃষ্টি ও ভক্তি পরায়ণ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহর রূপশোভা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যান ব্রহ্মানন্দ ভারতী আর ভাবেন কথাগুলি।

কলির মোক্ষক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে তিনি—এসেছেন কয়েকদিন। আর এখানেই কিনা দর্শন হয়েছে এমন একজনের যাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তীর্থে তীর্থে, ধামে ধামে। নিজের ঊষর চিত্তকে প্রেমের আর্দ্রতায় ভরিয়ে তোলার বাসনায়। অপূর্ণ থাকে না সে অভিলাষ। মহাপ্রভুর দর্শন ও স্পর্শে জেগে ওঠে প্রেমস্ফূর্তি অন্তরে তাঁর। প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় মুখ থেকে নির্গত হয় স্বল্পাকৃতি যুক্ত অনিন্দ্যসুন্দর প্রশস্তি—ত্বৎ সাক্ষাৎ কারণাাদবিশুদ্ধাবিবস্থিতস্য মে/সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদগুরো। **হে জগদগুরু তোমার দর্শনে আনন্দ সাগরে রয়েছি আমি। এখন আমার কাছে ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদ তুল্য মনে হয়।**

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর এই দর্শনের সময়কাল ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাস।

ঘোর জাতপাত আর অস্পৃশ্যতার যাঁতাকলে পরে নিচু তলার মানুষ সেইসময় পরিণত হয়েছে এক শ্রেণীর ক্রীতদাসে। তার ওপর বিজয়ী মুসলমান শাসকদের সীমাহীন অত্যাচার। এরই প্রতিবিধানের জন্য অদ্বৈতাচার্য প্রতিদিন নারায়ণ পূজা কালে একশো আট তুলসী নিবেদন করে কাতরভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন অরিমর্দনকারী দেবকীনন্দনের উদ্দেশ্যে অচিরে অবতারণের জন্য। সে প্রার্থনা শুনেছিলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি যে ব্রজপুর থেকে নদেপুরে আসছেন, সে অলৌকিক সঙ্কেতও দিয়েছিলেন। তা নাহলে অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুর থেকে হঠাৎ নবদ্বীপে এসে প্রভুর ছমাস গর্ভবাস কালে, তাঁর মাকে প্রদক্ষিণ করে, গর্ভে অঞ্জলি দিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করবেন কেন?

অদ্বৈতাচার্য মহাবতারণের এই বার্তা সীমাবদ্ধ রাখেনি নিজ মধ্যে। তাঁর ভাগবতগোষ্ঠীর কয়েকজন জেনে যান কথা। তাঁরা সাগ্রহে প্রতীক্ষমান ছিলেন পরমক্ষণটির জন্য। সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। বসন্ত এসে দাঁড়িয়েছে শুষ্ক, রুক্ষ, আড়ষ্ট প্রকৃতির দুয়ারে। আকাশে-বাতাসে বনবিটপীলতার পাতায়-পাতায়, পক্ষীকুলের কূজনে, অলির গুঞ্জনে, সুরধনীর তরঙ্গে জেগে উঠেছিল রঙের ব্যঞ্জনা। লেগেছিল নব উন্মেষের জোয়ার। আনন্দের হিল্লোল। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেই তো প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপরের শেষে গোপীজনবল্লভ শ্রী মাধব বৃন্দাবনে প্রকৃতির নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেদিন আবির-গুলাল-কুমকুমে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন গোবিন্দগতপ্রাণা গোপীদের দেহ-মন-আত্মা একাধারে।

মাধুর্যরসের সর্বোত্তম পরকাষ্ঠা গোপীপ্রেম বর্ণে, বৈচিত্র্যে, রসানুভূতির তীব্রতার যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তারই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ব্রজবিহারী দোললীলায়। আর গোপীরাও লাভ করেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকে আরও নিবিড়তর করার দুর্লভ সুযোগ।

আবিরে রাঙা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপবাসীর জীবনে এল সেই একই দুর্লভ সুযোগ। তা হল কৃষ্ণরূপী গৌরপ্রাপ্তি। রাহু যে মুহূর্তে গ্রাস করল শশীকে, আবির-কুমকুমে চর্চিত হল নদীয়াবাসী, সে মুহূর্তে জগন্নাথ মিশ্র জায়া শচীদেবী প্রসব করলেন হেমাঙ্গ গৌরাঙ্গকে। আবির্ভাব লগ্নে মুখরিত হল

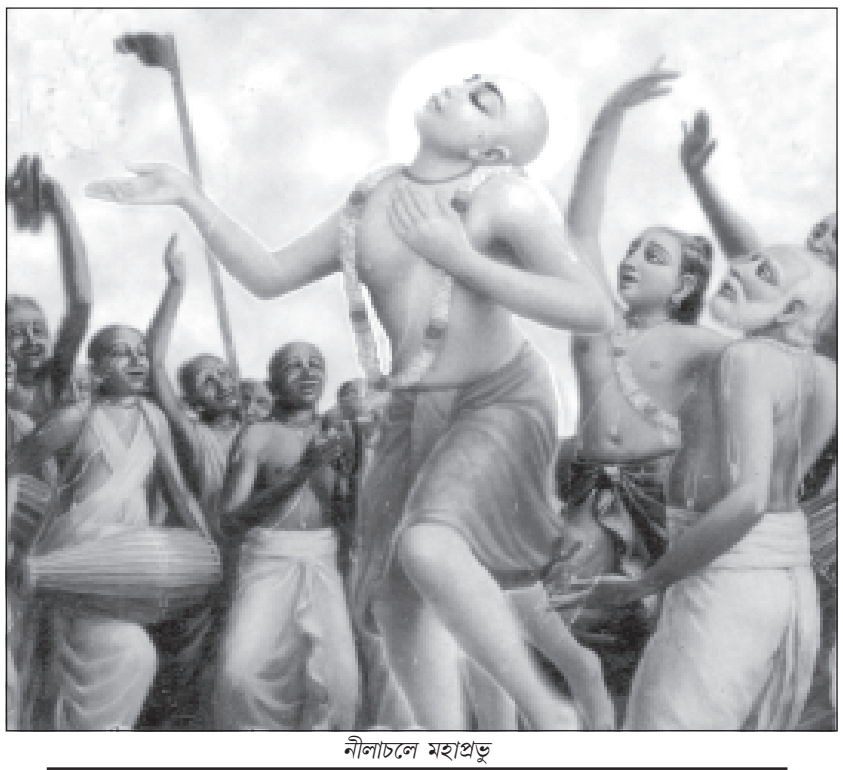

নীলাচলে মহাপ্রভু

জগন্নাথ ভবন হরিধবনিতে।

বিশ্বের ভার যিনি গ্রহণ করবেন, তিনিই তো বিশ্বম্ভর। জন্মের কুড়ি দিনের মাথায় নবজাত শিশুকে দেখে ছবির মতো আগামী দিনগুলিকে দেখে নিয়েছিলেন জনৈক দৈবজ্ঞ। বলেছিলেন—এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। বৃহস্পতি তুল্য হবে সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান। করবে ধর্মসংস্থাপন, জীব উদ্ধার আর অপরূপ ধর্ম প্রচার। দৈবজ্ঞের কথা মেনেই জগন্নাথ ও শচীদেবী তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর মিশ্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ তখন পনেরো বছরের কিশোর।

বিশ্বম্ভরের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীও দিয়েছিলেন। কন্যা শচীদেবীর এই সন্তানের কোষ্ঠী গণনা করে বললেন তাঁকে **'শ্রীমদ বৃন্দাবন পুরন্দর।'** নবদ্বীপবাসীরাও কানাঘুষো শুনে ভেবেছেন সত্যিই ব্রজপুর হতে নদেপুরে এসেছেন কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র হয়ে।

পরবর্তীকালে তাদের ধারণা গুলিয়ে যায়। যখন দেখে চার বছরের বিশ্বম্ভর হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় দুরন্ত। উত্তক্ত করছে সকলকে। দুরন্তপনা শেষ হয় একদিন। বড় ভাই বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর। বিশ্বরূপ তখন পরিবর্তিত সন্ন্যাসী শঙ্করাণ্য পুরীতে।

নয় বছর বয়সে উপনয়নের পর বিশ্বম্ভর ভর্তি হলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে। মাত্র তিন বছরে অধিগত করেন সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বলে। ১২ বছরের বয়সেই রচনা করেন কলাপ ব্যাকরণের অদ্বিতীয় টিকাগ্রন্থ যা দেখে গঙ্গা দাস তো বটেই, স্তম্ভিত নবদ্বীপ এবং বাংলার পণ্ডিত সমাজ। বিস্ময় সৃষ্টি করেন ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনার টোল খুলে। এরই মধ্যে অধিগম্য তাঁর ষড়দর্শন, স্মৃতি, বেদাদি শাস্ত্র, সুদর্শন পন্ডিত, বিষ্ণু মিশ্র, অদ্বৈত আচার্য ও বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিতদের অধীনে।

বিশ্বম্ভরের অধ্যাপনায় গুণে মুগ্ধ ছাত্ররা। বিশেষত তাঁর সূত্র ব্যাখ্যা, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তির বিচারে।

বিদ্যারসে উন্মত্ত এখন বিশ্বম্ভর। বিব্রত করে তোলেন যাকে তাকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা ও শাস্ত্র তর্কে প্রবৃত্ত করে। পড়ুয়া থেকে পন্ডিত সকলেই তাঁকে এড়িয়ে চলতে চান। নবদ্বীপের ভাগবতগোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা ভাবেন—**মানুষের এমন পান্ডিত্য দেখি নাই / কৃষ্ণ না ভজেন এবে এই দুঃখ পাই।**

তাদের কথা পৌঁছায় বিশ্বম্ভরের কানে। ছাত্রদের বলেন তিনি হেসে—এরা আমায় বুঝতে পারে না। আমি এমন বৈষ্ণব হব, যে সারা বিশ্ব আসবে আমার দুয়ারে। যারা আমায় ভাবে উদ্ধত চূড়ামণি, আমায় দেখে পালায়। তারাই একদিন আমার গুণকীর্তনে মুখর হবে।

হলও তাই। ১৫০৮ সালে পিতৃকার্য্যের জন্য গেলেন গয়াধামে। বয়স তখন ২২। সঙ্গে চন্দ্রশেখর আচার্য আর গুটিকয়েক ছাত্র। এরই মধ্যে ১৫০৪ সালে প্রথমা পত্নীর লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু। পরের বছর পুনরায় দার পরিগ্রহণ। দ্বিতীয়া স্ত্রী হলেন রাজপন্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা ১১ বছরের বিষ্ণুপ্রিয়া।

গয়ায় বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শনে মোহিত, ভাবাবিষ্ট তিনি। জেগে ওঠে স্বেদ, কম্প সহ অষ্টসাত্বিক বিকার। বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে মন্দির ভূতলে। কাছেই ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য ঈশ্বরপুরী। জ্ঞানহীন বিশ্বম্ভরকে তুলে নিলেন কোলে। সম্বিত ফিরে পেয়ে ঈশ্বরপুরীকে দেখে মহাহর্ষে প্রণত হলেন চরণে বিশ্বম্ভর। প্রার্থনা জানালেন মন্ত্রদীক্ষার। সানন্দে ঈশ্বরপুরী পাদ তাঁকে দিলেন দশাক্ষরযুক্ত গোপাল মন্ত্র যা জগন্নাথ ইষ্টমন্ত্রেরই নামান্তর।

ঈশ্বরপুরীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরুষ। বছর তিনেক আগে (১৫০৫) নবদ্বীপে প্রথম সাক্ষাতকারের পর। ভাবতেন এত পান্ডিত্য, এত মহত্ব মানুষের কি হয়! তাঁকে এবার দর্শনে যেন কৃষ্ণদর্শনের পরম সুখ লাভ করেছেন ঈশ্বরপুরীপাদ।

মন্ত্রলাভের পর বিশ্বম্ভরের জীবন ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। সর্বদা কাঁদেন "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলে। চোখের জলে সিক্ত বহির্বাস। কানে যায় গদাধর, মুরারি, সদাশিব, শ্রীবাস পন্ডিত প্রভৃতি নবদ্বীপের ভাগবতগোষ্ঠীর। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তাঁরা দেখেন বিশ্বম্ভরকে। অর্ধবাহ্য দশায়। চোখে এত অশ্রু, হৃদয়ে এত প্রেমাভক্তির প্রবাহ, এত ব্যাকুলতা! কল্পনা করতে পারেন না তাঁরা। ভাবেন একি সেই উদ্ধত গর্বিত বিশ্বম্ভর। না অন্য কেউ।

অধ্যাপনা আর করতে পারেন না বিশ্বম্ভর। মত্ত থাকেন শ্রীবাস অঙ্গনে নাম সংকীর্তনে। বদ্ধ গৃহে নাম চলে রাত্রি হতে প্রভাত। থাকেন সেখানে একমাত্র শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর, নিত্যানন্দ, মুরারী গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ভক্তজন। চলে এক বছর কীর্তন এইভাবে।

১৫০৯-এর ২৯ পৌষ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে নানা লীলাবিভূতি। তাঁরা বিশ্বম্ভরের মধ্যে দর্শন করেন আপন আপন ইষ্টকে। অদ্বৈত প্রভু তাঁর পায়ে অর্ঘ্য দেওয়া মাত্র, বিশ্বম্ভর সম্মোহ অবস্থায় বলে ওঠেন—**তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি। বিস্তর আমার আরাধনা করিলে তুমি / দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে/ আমারে আনিলে সর্ব জীব উদ্ধারিতে।**

প্রেমাবিষ্ট বিশ্বম্ভরকে পূজা করলেন এবার অদ্বৈতাচার্য ষোড়শোপচারে। কৃষ্ণমন্ত্রে। আবিষ্ট প্রভু চরণ রাখলেন অদ্বৈতের মস্তকে। অস্ফুট স্বরে বললেন—অদ্বৈত বর প্রার্থনা কর। তোমার জন্যই আমার এই প্রকাশ। আজ থেকে ঘরে ঘরে করব আমি সংকীর্তন প্রচার। শুনে অদ্বৈত বলেন—প্রভু তাই যদি কর, তাহলে নারী, শূদ্র ও মূর্খদেরও সে অধিকার দাও। প্রভু বললেন—তথাস্তু। এরপর তিনি কীর্তনানন্দকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। কীর্তন অঙ্গনে ব্রাহ্মণ থেকে অন্ত্যজ সকলের হল সমান অধিকার।

এবার সংকল্প নিলেন প্রভু সন্ন্যাসের। ১৫১০ সালের ১লা মাঘ। উপস্থিত হলেন প্রভু কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কুটিরে। ২রা মাঘ প্রাতে পূর্ণিমায় প্রভু নিলেন সন্ন্যাস। সন্ন্যাসবিহিত নাম হল "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী।" কেশব ভারতীর এ নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রভুর বক্ষে হাত রেখে বলেছিলেন কেশব ভারতী—**যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া / করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিয়া / এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য/সর্বলোকে তোমা হইতে যাতে হৈল ধন্য।** এই বলে তিনি প্রভুর হাতে তুলে দিলেন দন্ড-কমন্ডুল।

৩রা মাঘ প্রভু স্থির করেন, যাবেন এবার নীলাচলের পথে। যাবার পূর্বে একবার এলেন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে শান্তিপুরে। মা ও নবদ্বীপের ভক্তদের দর্শন দিয়ে আটিসরা (বারুইপুর), ছত্রভোগ (মথুরাপুর), প্রয়াগ ঘাট (মেদিনীপুর), রেমুনা যাজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর হয়ে পৌঁছালেন নিজ প্রিয় ধাম নীলাচলে ১৯ ফাল্গুন (১৩ ফেব্রুয়ারি) দোলযাত্রার দিন। সঙ্গে স্বরূপ দামোদর (পুরুষোত্তমাচার্য) নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পন্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত।

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরে জগন্নাথদেবের অখিলরসামৃত মূর্তি দর্শনে আত্মহারা প্রভু। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় হুঙ্কারে কাঁপিয়ে তোলেন দেবালয় অভ্যন্তর। অর্ধবাহ্যদশায় আলিঙ্গন করতে উদ্যত হন বিগ্রহকে। অচল প্রভু যে ডাকছেন সচল প্রভুকে। বাধা দেয় পান্ডা-পরিছারা। সম্বিত হারা হয়ে পড়ে যান প্রভু ভূতলে। ঠিক সেসময় উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের সভাপন্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এলেন বিগ্রহ দর্শনে।

বাহ্যজ্ঞানহীন প্রভুকে পান্ডাদের সাহায্যে নিয়ে এলেন নিজ আলয়ে। প্রভুর নয়নাভিরাম রূপ আর কৃষ্ণপ্রেমের মহাসাত্বিক বিকার দেখে স্তম্ভিত বাসুদেব সার্বভৌম। যখন জানলেন প্রভুর প্রকৃত পরিচয়, হর্ষিত হন তিনি।

এরপর মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের ইচ্ছাক্রমে প্রভুর স্থান হয় রাজগুরু কাশী মিশ্রের গৃহে। তাঁর কাছে বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রমুখ পন্ডিত ও রাজপুরুষের আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করে উৎকলবাসীরা তাঁকে সচল জগন্নাথ রূপে মানতে শুরু করেন।

১৫১০ থেকে ১৫১৬ সাল পর্যন্ত ছয় বছর প্রভুর কেটে যায় ভারত পরিব্রাজনে। এরপর পাকাপাকিভাবে থেকে যান পুরীধামে। ১৫১৯ থেকে তার মধ্যে দেখা যায় দিব্যোন্মাদ অবস্থা। মহাভাবের প্রকাশ। সেবছর রথযাত্রার দিন নৃত্যোন্মত্ত প্রভুর ভাবাবিষ্ট কান্তি দর্শনে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে শ্রীক্ষেত্রাধীশ্বরের সচল রূপ বিবেচনা করে 'মহাপ্রভু' বলে ঘোষণা করেন। শুনে স্বীকৃতিস্বরূপ সমবেত ভক্ত ও উৎকলবাসীরা সমস্বরে হরিধবনি করে ওঠেন।

এইভাবে কাটে আরও চোদ্দটি বছর। মহাপ্রভু তখন মহাউন্মনী অবস্থায়। শ্রীমুখ থেকে উদগীত দুটি

(এরপর ১৩ পাতায়)

বাংলাদেশের পালাবদল

গত ৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার "স্বস্তিকায়" বাংলাদেশের পালাবদল সংক্রান্ত বেশ কিছু অসাধারণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সরকার বদল হয়েছে। খালেদা জিয়ার অত্যাচারী বর্বর সরকারকে টেনে নামিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রয়াত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা হাসিনাকে তাদের সরকারের সিংহাসনে বসিয়েছেন। প্রচার শুরু হচ্ছে যে এবার সাধারণ মানুষজনের বিশেষ করে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের অবস্থার উন্নতি হবে, অর্থনৈতিক অবস্থার হাল ফিরবে। যদিও অতীতে এই শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের কাজকর্মে বাংলাদেশের জনসাধারণ খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু অন্য কোনও সম্ভাব্য বিকল্প তাদের সামনে না থাকায় তারা আবার শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন।

বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভাষাগত এবং চরিত্রগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই দুটি দেশের মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতিগত মিল অনেকটাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত সবসময় ছিল বাংলাদেশের পাশে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও এটা বাস্তব যে, পরবর্তীকালে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে দৃঢ়তর বন্ধন আশা করা হয়েছিল, সেটা বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক কারণে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। পূর্বতন খালেদা জিয়ার আমলে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল। সেই সময় বাংলাদেশের জঙ্গি কার্যকলাপ এবং পদক্ষেপ যেন ছিল পাকিস্তান নামক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ভারত সরকার প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ছিল নরম মনোভাবাপন্ন এবং তার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। দিনের পর দিন তারা ভারত সরকারের কথায় কর্ণপাত করেনি, চালিয়ে গেছে একের পর এক ভারতবিরোধী কার্যকলাপ এবং তলায় তলায় পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে গেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কংগ্রেস ও মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বকে খাটো করে দেখাতে বদ্ধপরিকর। এই ঘটনার ফলস্বরূপ আপোষকামী গান্ধীজী আপোষহীন সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

সেই একই ট্র্যাডিশন আজও সমানভাবে চলছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে, কোনও কড়া পদক্ষেপ নেয়নি। একমাত্র এন ডি এ সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তারপর আবার যেই কে সেই অবস্থা। বাংলাদেশ জনভার-পীড়িত এক গরীব দেশ। আর এই গরীব জনভারই ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের প্রচ্ছন্ন পদাতিক বাহিনী। ঘাতক দালাল মৌলবাদী বাংলাদেশী অধ্যাপক গোলাম আজম জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ইসলাম বিরোধী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তার যুক্তি, বাংলাদেশের জনভার লাঘব করবে ভারত। ভারতে আশ্রয় নেবে বাংলাদেশীরা। আহা কী আপ্লুত যুক্তি!

আর এই নীতির ফলেই প্রায় তিন কোটি বাংলাদেশী মুসলমান বর্তমান ভারত দখল করে আছে। কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকায়। সঙ্গে প্রশ্রয় রয়েছে মার্কসবাদীদেরও। পশ্চিবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে বেছে বেছে মূলত হিন্দু বাড়িতে বাংলাদেশীরা ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ এবং লুঠ-পাট চালাচ্ছে। তার প্রতিক্রিয়ায় আতঙ্কিত হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে আরও পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করছে বাংলাদেশী মুসলমানরা। সল্টলেক সংলগ্ন এবং অন্যত্র ঝুপড়িবাসীরা এখন অধিকাংশই বাংলাদেশী মুসলমান। এই সমস্যা এখন দিল্লী, মুম্বাই, বাঙ্গালোর প্রভৃতি মহানগরীতেও। সম্প্রতি দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম ভারতের মুসলমান ও তপশিলি সম্প্রদায়কে নিয়ে ১৯০৭-৪৭-এর ধাঁচে নতুন দল গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশন থেকে আমরা উভয় সম্প্রদায়ই কোনও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের পালাবদল বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নতুন দিশা দেখাতে পারে কিনা তা সময়ই বলবে।

—সুশান্ত দে, গ্রীণ পার্ক, কলকাতা-১০৩

বিজেপি-র ইস্তেহার

দেখুন মনে প্রাণে আমি একজন হিন্দু। সামনে লোকসভা নির্বাচন, আমি চাই বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসুক। এক্ষণে আমার কিছু মতামত পাঠালাম, যাহা ভোটের ইস্তেহারে বিজেপি-র আনা উচিৎ এবং নির্বাচন প্রচারে বিজেপি-র তরফে প্রচার করা দরকার, যদিও আমি জানি বিজেপি পার্টিতে বহু জ্ঞানীগুণীজন আছেন।

১। সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি, সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি। (দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশে শেখ্ হাসিনা সরকারে ফিরেছে)। বিজেপি দাম কমানোর কথা বললে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে, কারণ বিজেপি সরকারে থাকার সময় প্রতিটি জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ছিল।

২। ভোটের পর আন্তর্জাতিক বাজারে যদি তেলের দাম একই রকম থাকে, তবে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আরও কমানো হবে।

৩। উচ্চ বর্ণের গরীবদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ও চাকুরীক্ষেত্রে ২৯ থেকে ৩৯ সংরক্ষণ দেওয়া হবে।

৪। কাশ্মীরে কাশ্মীরী পন্ডিতদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৫। বিজেপি এলে প্রতিটি প্রান্তিক চাষীকে স্বল্প সুদে ব্যাঙ্ক লোন দেওয়া হবে।

৬। নরসিমা রাও-এর আমলে আজকের প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ছিলেন, আবার তার আমলে রাজুকে দিয়ে সেই শেয়ার কেলেঙ্কারি।

৭। অপদার্থ শিবরাজ পাটিল গোয়েন্দা বিভাগকে অকেজো করে রাখার জন্যই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

৮। অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমের জন্য ভারতের অর্থ ব্যবস্থার এই হাল। তাকে তড়িঘড়ি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে বসানোয় ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। কারণ যে ছাত্র একটি বিষয়ে ফেল করে সে অন্য বিষয়ে যে পাশ করবে তার কোনও গ্যারান্টি নাই।

—চন্দন মুখার্জী, জেলখানা মোড়, পুরুলিয়া

প্রয়াত স্বপনদা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুরের বিভাগ কার্যবাহ স্বপন কুমার ঘোষ (৫৮) হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন বয়স্কা মাতৃদেবী, স্ত্রী, মেয়ে, জামাই, নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক বন্ধুদের।

কলেজ জীবন থেকেই মেদিনীপুর শহরে মাসির বাড়িতে থেকে স্নাতক হয়েছেন (১৯৭৩)। সেই সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাথে পরিচয়। সঙ্ঘের ২য় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মেদিনীপুর কলেজে করণিকের পদে প্রথমে অস্থায়ী, পরে স্থায়ীভাবে চাকুরি করতেন। সঙ্ঘের দায়িত্বে প্রথমে মেদিনীপুর নগর কার্যবাহ, জেলা কার্যবাহ, পরে বিভাগ কার্যবাহ হয়েছেন।

মেদিনীপুর শহরে বসবাস ও কলেজে চাকুরীর সুবাদে সমস্ত স্তরের মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ। সঙ্ঘ তথা বিবিধ সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রমের খুঁটিনাটি চিন্তা করতেন। প্রত্যেকের কাজের সহযোগিতা করতেন। দায়িত্বের ভারও নিতেন।

আত্মীয় স্বজন বা স্বয়ংসেবক পরিবারের ছেলেমেয়েরা কে কোথায় পড়বে, কার Form Fill-up করতে হবে, কলেজ Library থেকে বই দেওয়ানো— সবেতেই স্বপনদার নিশ্চিত সহযোগিতা। কলেজের হিসাবের কাজ, Income Tax Calculation, চাকুরী সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ছাত্রদের University-র নিয়মাবলী—এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন সবার কাছে একজন নির্ভরযোগ্য সহযোগী। কলেজে কর্মরত নন এমন ব্যক্তি বা প্রাক্তন অধ্যাপকদের Income Tax Calculation করে নিজের দায়িত্বে সেই কাগজ জমা দেওয়া তার ছিল নিরন্তর কাজ। শরৎপল্লীতে সরস্বতী শিশুমন্দির গড়ার পেছনে যে ক'জন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, স্বপনদা তাদের মধ্যে অন্যতম। সবমিলিয়ে আমরা একজন স্বয়ংসেবক (আক্ষরিক অর্থে) হারালাম। স্বপনদার জীবন ও কর্ম আমাদেরকে প্রকৃত স্বয়ংসেবক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করবে—এই আশা রেখে ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

—তিলক রঞ্জন বেরা, খড়্গপুর।

সামনে বিপদ

শ্যামল হাতি

ভারতের সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। তালিবানিরা আমাদের সীমান্তের কাছেই অবস্থান করছে। গোটা দেশে মুসলিম মৌলবাদীদের বাড়-বাড়ন্ত চলছে। দেশের প্রমুখ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা সবকিছু দেখেও যেন দেখতে পাচ্ছে না। তারা শুনেও শুনছে না। তারা সবাই মেতে উঠেছে ওই মৌলবাদীদের তোষণের খেলায়। কে কত মুসলিম "ব্লক" ভোট পাবে তার নগ্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথচ ভারতের নৌ-সেনা প্রধান সুরেশ মেটার কাছে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, সমুদ্র পথে এদেশে ঢুকতে পারে পরমাণু অস্ত্র। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়েছেন। আমাদের গোয়েন্দাদের কাছে খবর আছে হিমাচল প্রদেশের এবং পাঞ্জাবের ছটি বাঁধ দখল করে তার লক-গেট খুলে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করবে জঙ্গিরা। তালিবানিরা ইতিমধ্যেই হুমকি দিয়েছে ২৬/১১ মুম্বাই বিস্ফোরণ নিয়ে পাকিস্তানের উপর বেশি চাপ বা তাদের আক্রমণ করলে সারা দেশে তারা আরও ২৬/১১-এর মতো ভয়াবহ কান্ড ঘটাবে।

পাকিস্তানের অশান্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সোয়াত উপত্যকাসহ মালকন্দ ডিভিসনে শরিয়তি আইন ও তালিবানি শাসন চালু হয়েছে। পাক সেনা বাহিনী তালিবানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ওখানে শান্তি ক্রয় করেছে। এটা আত্মসমর্পণ না অন্য কিছু গেম প্ল্যান? এটাই এখন আমাদের ভাবাচ্ছে। ওই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পাক-পাঞ্জাবের দূরত্ব বেশি নয়। আর পাক-পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর থেকে আমাদের ওয়াঘা সীমান্ত ৩০/৩৫ কিমির বেশি নয়। তাই তালিবানিদের লক্ষ্য পাক-পাঞ্জাবে নিজেদের অধিকার কায়েম করা। একবার পাক-পাঞ্জাবে ওদের অধিকার কায়েম হলে ওরা ভারতের সীমান্ত পেরুতে দেরী করবে না।

আমাদের দেশের অনেকগুলি দলের বেশ কিছু মানুষ এসব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ব্যাপার বলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমাদের সমস্যা সেখানেই। এরা সবাই আধুনিক "কালিদাস"। এদিকে দেশে জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ক্যান্সার রোগের মত বাড়ছে। আমাদের কী রাজ্য, কী কেন্দ্র সরকার— সব জানে। দেশের কমুনিস্ট পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস মায় তৃণমূল কংগ্রেসও সব জানে। তবু তারা চুপ। ভয় ভোটে 'ধস' নামা। এরা সবাই আসল সত্য সামনে আনতেই চায় না। বরং এরা উল্টো কথা বলে জনগণের চোখ ঘুরিয়ে দিয়ে। ওদের অর্থাৎ মৌলবাদীদের কাছে হিরো হতেই ব্যস্ত। তা না হলে দিল্লী পুলিশের অফিসার প্রকাশ শর্মার মৃত্যুর পরও দিল্লীর বাটলা হাউসে গিয়ে অমর সিং ও মমতা ব্যানার্জী উল্টো কথা বলতে গেলেন কেন? যে বাড়িতে সন্ত্রাসবাদীরা অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিল এবং ওদের গুলিতেই আমাদের একজন সৎ-সাহসী পুলিশ অফিসার বুলেট বিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পরও মমতা-অমর সিং-রা ওখানে জঙ্গিদের সমর্থনে সভা করে কেন? বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলে মেয়েরাও বুঝতে পারবে যে, ওদের লোভ শুধু ভোটের জন্য। তাতে

দেশের নিরাপত্তা জলাঞ্জলি যায় যাক। ওদের শুধু ভোট চাই। আমাদের বিপদ এই সমস্ত ভোট সর্বস্ব নেতাদের নিয়েই। ওদের ভ্রান্ত নীতির জন্য আমাদের নিরাপত্তা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে।

২৬/১১ মুম্বাই আক্রমণের পর আমাদের সরকারের ভূমিকাই বা কি? আমরা সবাই জানি সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘর হল পাকিস্তান, বাংলাদেশ। আমাদের সরকার মুম্বাই হামলায় পাকিস্তানের হাত ছিল তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমরা তার জন্য সাধুবাদ জানাই। সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের জন্যও আমরা সাধুবাদ জানাই। লোকসভার বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানীও লোকসভায় দাঁড়িয়ে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার জন্য ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীও লালকৃষ্ণ আদবানীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এতো গেল একটা দিক। এই সামান্য কাজ দেখিয়ে ওরা রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে গেল। তবু আমাদের মনে ইউপিএ-এর শাকরেদদের উপর সন্দেহ হয়। তালিবানিরা যখন ধমক দিচ্ছে পাকিস্তানের উপর বেশি চাপ দিলে বা তাকে আক্রমণ করলে ভারতে আরও অনেক ২৬/১১-এর মতো কান্ড ওরা ঘটাবে। আমাদের মধ্যে ওদের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক না থাকলে ওরা কখনই এত বড় কথা বলতে পারত না। এদের খুঁজে বার করার কোনও সদিচ্ছা ইউপিএ সরকার দেখায়নি। স্বাভাবতই আমাদের অনেকেরই মনে হচ্ছে এই সরকার সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতাদের উপর বেশ কিছুটা নরম মনোভাব রাখছে। তাজ হোটেলের মতো ভিআইপি মার্কা হোটেলে এখানকার মদতদাতাদের সাহায্য ছাড়া কী করে আজমল কাসভ বাহিনী ৬ মাস ধরে অস্ত্র মজুত করল? আমাদের সরকার তার জন্য কেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করল না? ৯/১১ পর আমেরিকা এবং লন্ডনের মেট্রো রেল ও অন্যত্র বিস্ফোরণের পর ওরাও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। তাহলে আমাদের সরকারের কি অসুবিধা ছিল? আমরা কেন তা করতে পারলাম না? যেভাবে অমর সিং-মমতা ব্যানার্জীরা দিল্লীতে সভা করে সরকারকে মুসলিম বিরোধী বলেছিল, এক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচনের আগে কি সরকার ভয় পেল? এই ভয় কিসের? এই ভয় হল—ব্লক ভোট হারাবার ভয়। তা হলে এক্ষেত্রে আমরা যারা সাধারণ জনতা তারা কি পেলাম? আমরা পেলাম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার যন্ত্রণা। আমরা পেলাম তালিবানিদের চোখ রাঙানো। আমরা রইলাম আতঙ্কে। আর ওরা ব্যস্ত ভোট গোণার খেলায়। এখন সময় এসেছে এইসব ছদ্ম সেকুলার নেতা ও দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। সময় এসেছে আগুন নিয়ে খেলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। আগুন যেমন জাত-ধর্ম দেখে না, ধনী-নির্ধন দেখে না, তেমনি তালিবানিরাও জাত-ধর্ম দেখে না। তাই তো বিনা সঙ্কোচে জিও টিভির সাংবাদিক মুসা খানকে হত্যা করেছে। আসুন আমরা এদের বিরুদ্ধে শপথ নিই। এই সব মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

পরম্পরা

শ্রীচৈতন্য পরিকর শিরোমণি
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য

ডঃ সুজলা কুণ্ডু

পঞ্চ দশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম ও সমাজ জীবনে এক গ্লানিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। "পরোধর্ম ভয়াবহ" অতি প্রবলভাবে সনাতন ধর্মকে কবলিত করতে উদ্যত হয়েছিল। মানবতাভ্রষ্ট মানুষের অমানুষিকতায় দগ্ধীভূত হয়েছিল মানব সমাজ। সমগ্র সমাজ কাঁদছিল একটি প্রাণ জুড়োবার মানুষের জন্য। সকলের বেদনাভরা-হৃদয়ের আর্তি একত্রিত হয়ে এক প্রাণবন্ত সাগর সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত নবগ্রাম অঞ্চলের কমলাক্ষ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে। তিনি আর্তনাদ করেছিলেন একটি প্রাণ জুড়োবার মানুষের জন্য, সমাজকে শান্ত-তৃপ্ত করার জন্য। গঙ্গাজল, তুলসীপাতা হাতে নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।।

এই কমলাক্ষ ভট্টাচার্যের নামই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের থেকে বাহান্ন বছরের বড় এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সকলের শিরোমণি এবং তাঁর লীলার প্রধান সহায়ক। চৈতন্যদেবের অবতারত্ব বিষয়ের প্রথম সূত্রপাত করেন তিনিই।

শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন— কমলাক্ষের নাম অদ্বৈতাচার্য হওয়ার কারণ তিনি শ্রীহরির সঙ্গে অভিন্ন বলে শ্রীঅদ্বৈত এবং ভক্তি ধর্মের প্রচারক বলে আচার্য। অনেকে অদ্বৈত সিংহ বলেও ডাকতেন কারণ তৎকালীনযুগে ভক্তি জগতে তিনি সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁকে শান্তিপুর নাথ, সীতাপতি, কুবেরনন্দন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য ধর্ম আন্দোলনের আদি প্রবর্তক শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। আচার্য কুবের পিতার নাম, মাতার নাম নাভা দেবী।

আচার্য কুবের ছিলেন ধনশালী। ধার্মিক ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ-র মন্ত্রী ছিলেন তিনি। রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের পূর্বপুরুষ। ঠাকুর অদ্বৈত আচার্য জন্মগ্রহণ করেন শ্রীহট্ট জেলার লাউড়ের নবগ্রামে। নাভা দেবীর পর পর সাতটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ সন্তান কমলাক্ষ। কমলাক্ষ পরবর্তী জীবনে অদ্বৈত আচার্য নামে শান্তিপুরে অধিষ্ঠিত হন। প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁকে 'শান্তিদ্বীপ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

শ্রী অদ্বৈত আচার্য অধিকাংশ সময় থাকতেন শান্তিপুরের বাবলা গ্রামে। তাঁর পূজিত শ্রীবিগ্রহের নাম ছিল মদন গোপাল। তিনি প্রত্যহ শ্রী মদন গোপালকে তুলসী, চন্দন, গঙ্গাজলে পূজা করতেন। দুর্দশাগ্রস্ত জীবের কল্যাণের জন্য

প্রার্থনা নিবেদন করতেন। প্রতিদিনের মতো একদিন তিনি বাবলার গঙ্গাতীরে বসে কাতর স্বরে প্রার্থনা করছেন—"মদন গোপাল এস, এস" বলে। হঠাৎ দেখেন যে, একটি তুলসী পত্র গঙ্গার প্রবল স্রোতের উল্টোদিকে ভেসে যাচ্ছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তুলসী পত্রটিকে অনুসরণ করে গঙ্গার তীর ধরে চললেন। তুলসী পত্রটি এসে গঙ্গার ঘাটে স্নানরতা এক রমণীর নাভিতে স্থির হয়ে গেল। অদ্বৈতাচার্য বুঝলেন এই গর্ভেই আবির্ভূত হবেন তাঁর মদন গোপাল। লোকের নিকট পরিচয় নিয়ে জানলেন যে তিনি শ্রী হট্টের পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা। অদ্বৈত আচার্য প্রতিদিন এসে সকলের অগোচরে জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচী দেবীর গর্ভ বন্দনা করতেন।

বাবলাগ্রাম অদ্বৈতাচার্যের মহাতপস্যার ভূমি। কালের গতিতে এই তপস্যাভূমি বনজঙ্গলে আবৃত হয়ে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, সীতানাথ দাস নামে এক সাধু ওড়িশার অন্তর্গত বালেশ্বরে অবস্থানকালে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় উদ্ধার করেন এই লুপ্ত তীর্থ। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিজ মুখে বলেছেন যে, তিনি এই স্থানে গভীর রাত্রিতে সঙ্কীর্তনের ধ্বনি শুনেছেন। সুতরাং একথা সত্য যে—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।

এই স্থানটি যে শুধু অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান তা নয়, এর সাথে জড়িত অনেক পুণ্যস্মৃতি।

অদ্বৈতাচার্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর গুরুভ্রাতা। এই কারণে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এই সম্মান অদ্বৈতাচার্যের একেবারেই পছন্দ হতো না। তাঁর ইচ্ছা ছিল চৈতন্যদেব তাঁকে 'তুই' বলে ডাকেন ও শাসন বাক্যাদি বলেন, যেমন অন্য বয়সের ছোট ভক্তদের ক্ষেত্রে করে থাকেন। তাই তিনি চৈতন্যদেবকে ছেড়ে নবদ্বীপ থেকে বাবলায় চলে আসেন এবং যোগাবশিষ্ট অবলম্বনে জ্ঞানচর্চা করতে থাকেন। জ্ঞানই সার, জ্ঞানেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ভক্তি কিছু নয়—ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে থাকেন। একদিন চৈতন্যদেব শ্রীমন্ নিত্যানন্দসহ গঙ্গা সাঁতরিয়ে বাবলায় আসেন এবং তাঁকে কিল-চড়সহ বেদম প্রহার করেন এবং বলেন—

শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীর সাগর মাঝে।
আড়ে নাড়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে।।
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন কাজে।।

প্রহার করবার সময় মহাপ্রভু তাঁকে বহুবার 'তুই' সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধন ও শাসনে অদ্বৈতের প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের উদয় হল।

একদিন অদ্বৈতাচার্যের মাতা নাভা দেবী পুত্রকে বলেছিলেন—"আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আন।"

অদ্বৈত আচার্য বললেন—"তোমার এখন তীর্থ গমনের বয়স নাই, আমি সব তীর্থ এখানে আনয়ন করব।" তিনি বারুণী স্নানের দিন নদীর ঘাটে গিয়ে সব তীর্থকে আবাহন করলেন। নদীর দুই দিক থেকে যমুনার কালো জল, গঙ্গার নির্মল জল, সাগরের নোনাজল এবং নানা প্রকার পীত ও রক্তবর্ণ তীর্থ-জল দেখালেন। মাতা নাভা দেবীও স্নান করে পরিতৃপ্ত হলেন। সেদিন থেকে এই তীর্থের নাম হল "পণ তীর্থ"। সেই থেকে—

.... পণ্যতীর্থ হইল বিখ্যাত।
বারুণি যোগেতে স্নান বহু ফলপ্রদ।।

অদ্বৈত আচার্যের আধ্যাত্মিকতা ও আহ্বানে বিভিন্ন তীর্থের পুণ্য সলিলের সমাবেশে সৃষ্টি পণতীর্থ নাম তাই সার্থক হয়েছে। আজও বারুণি যোগে শ্রীহট্টের সেই দুর্গম এলাকায় অবস্থিত পুণ্যতীর্থে অসংখ্য পুণ্যার্থীর সমাবেশ হয়ে থাকে।

শ্রী অদ্বৈতাচার্যের পাঁচ পুত্রের মধ্যে অর্থাৎ অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, বলরাম, গোপাল ও জগদীশের মধ্যে অচ্যুতানন্দই সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য যে কেবল ভক্ত ছিলেন তা নয়, তিনি জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ তাঁর ভক্তিভাব দেখে তাঁর কাছে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হন। জীবনের শেষ দিকে রাজা দিব্য সিংহ আচার্যের বাল্য জীবনের কথা সংস্কৃত ভাষায় 'বাল্য লীলা সূত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব জগতে রাজা দিব্য সিংহ 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত হন।

শ্রী অদ্বৈতাচার্যের বহু ভক্ত শিষ্যের মধ্যে ইন্দোননাগর এবং ভক্ত হরিদাস ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের প্রিয় শিষ্য। হরিদাস প্রথমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেজন্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা আচর্যকে সমাজচ্যুত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং বললেন—"কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনে যে ফল হয়, হরিদাসকে খাওয়ালে সেই ফল হয় বলে আমি মনে করি।" হরিদাসকে দীক্ষা দিয়ে অদ্বৈতাচার্য দেখালেন যে 'ভক্ত' ও 'ভক্তি'র কাছে জাত বিচার নাই।

(এরপর ১৩ পাতায়)

জাতীয় চেতনার পথিকৃৎ সন্ন্যাসী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য

কিশোরী দাস বাবাজী

সনাতন ধর্মের সংরক্ষক, নিপীড়িত জাতির পরিত্রাতা, ভক্তিধর্মের সংস্থাপক ও বিশ্বমানবের কল্যাণ বিধানের পথ প্রদর্শক নিমাই পন্ডিত জাগতিক কল্যাণে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারণ করলেন। সেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের পাঁচশত বর্ষ পূর্তিকাল সমাগত। সেই শুভ সন্ধিক্ষণই বর্তমান জাগতিক বিপর্যয়ের দিনে বিশেষ স্মরণীয়। পরিত্রাতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পদারবৃন্দে আত্মনিবেদনের এই শুভ সন্ধিক্ষণ আমাদের দিব্যভাবে বিভাবিত করুন; ইহাই একান্ত কাম্য।

আত্ম নিবেদনের উৎসের এক শাস্ত্রীয় শ্লোক আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। যথা—

ভক্তি যোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণ চৈতন্য নামধৃক।।

ভক্তি যোগ প্রকাশের মাধ্যমে জীবজগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই সন্ন্যাস আশ্রম পরিগ্রহ করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারণ করলেন। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা প্রদান প্রসঙ্গে যে মনের অভিব্যক্তি পোষণ করেছিলেন ; লোচনদাস কৃত শ্রী চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখন্ডের একাদশ অধ্যায়ের বর্ণনা, যথা—

আমার বিচ্ছেদ ভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল কলেবর।।
আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।
কেমন বিপরীত কর মোরে তোরা লোক।

এই বাক্যের মাধ্যমে শ্রীরাধার ভাবকান্তি বিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরের ব্রজ অভিলাষিত তিন বাঞ্ছা পূরণের এক নিগূঢ় রসের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থান করে নিজরস আস্বাদন করেছেন। তিনি নিজে আচরণ করে ভক্তিপথগামী সাধকগণের ভজনের পদ্ধতি ও পরিণতির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তা অদ্যাপি আপামর জনমানসে উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিভাত রয়েছে। অন্যদিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পদব্রজে নীলাচল যাত্রা, দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ, গৌড়দেশ পরিক্রমা, বৃন্দাবন যাত্রা কালে ঝারিখন্ডে পথে পশুপক্ষীকে নামে-প্রেমে বিভোর করে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সার্থকতার মূল্যায়ণ ঘটিয়েছেন। সর্বত্র কৃষ্ণ নাম। সঙ্কীর্তনে প্রেম বৈভব প্রকাশ করে উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পন্ডিত সর্বশ্রেণীকে সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে এক অভিনব প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে বিজড়িত করেছিলেন। সর্বত্র ভ্রমণ করে অপ্রাকৃত প্রেমবৈভব প্রকাশের মাধ্যমে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ভক্তিপথে আনয়ন, রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা প্রদর্শন, রায় রামানন্দ মুখে কৃষ্ণলীলা তত্ত্ব স্ফুরণ, কুর্মতীর্থে গীতাধ্যায়ী বিপ্রের মহিমা প্রকাশ ও বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠ ব্যাধি নিবারণে বৈভব প্রকাশ, গৌড়দেশে আগমনে দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর ভবনে আগমন করে শ্রীচৈতন্য ডোবা সৃষ্টির বিলাসে ঐকান্তিক গুরুভক্তির প্রকাশ, চাপাল গোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন, কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ভক্তিপথে আনয়ন, শ্রীরূপ-সনাতনকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও আপামর জনমানসে প্রচারের নির্দেশ; তাঁর সন্ন্যাস লীলার বৈচিত্র্যময় রূপ। তদুপরি সন্ন্যাস গ্রহণ করে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করে একই সময়ে তিন স্বরূপে যে লীলার বিকাশ ঘটিয়ে লীলাকীর্তির স্মৃতি রক্ষা করেছেন, তা অবর্ণনীয়। চাকদায় ধাত্রীমাতা দুঃখিনী দেবীর দুঃখ নিবারণে "গৌর গোপাল মূর্ত্তি ধারণ একই কালে শ্রীহট্টে গমন করত প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করে ঠাকুর মা শোভাদেবীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে "শ্রীগৌর—কৃষ্ণ" স্বরূপে বিরাজমান থেকে অদ্যাপি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস লীলার বহু বৈভব প্রতিভাত করেছেন। তাই যথার্থই বলতে হয়, প্রভু সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ না করলে কঠোর বৈরাগ্য সহ শ্রীকৃষ্ণ ভজন, ভজনের পরিণতি ও প্রাপ্তির উপায় উপলব্ধি করা যেত না। তৎসঙ্গে সার্বজনীন ঐক্যতায় আসমুদ্র হিমাচল কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে নামে-প্রেমে বিভোর হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতো না। তারই প্রতিফলনে আজ শ্রীকৃষ্ণ নামে উদ্ভাসিত সারা বিশ্ব।

লক্ষ্যস্থির

বঙ্গারুস্বামী লেখাপড়া করলেও তাতে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। মা লেখাপড়ার বিষয়ে কম বকাবকি করেন না। ছেলে বড় হলেও, প্রায়ই বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। রবিবারের ছুটির দিনে দুপুরের অবসর সময়ে একদিন মা বঙ্গারুস্বামীকে ডেকে বললেন, তুই কি পড়াশোনাটা ঠিক মতো করবি না বাবা? জীবনে তো তোকে বড় হতে হবে। তাছাড়া আমাদের কথাটাও একবার ভাব। লোকে আমাদের নামেই দুর্নাম করবে। তুই বড় হয়েছিস। কান ধরে, মেরে-ধরে তো আর শেখানো যায় না। লেখাপড়া ভালো না লাগলে ছেড়ে দে। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে? ব্যালকনির ধারে বসে বঙ্গারুস্বামী মা'র সমস্ত কথাই মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু মুখের ওপর জবাব দিতে সে কখনও শেখেনি। বড় হলেও মা'র কথা কাটে না সে। ছেলের কাছ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর না পেয়ে তিনি হাতের কাছে যা ছিল, তা খাটের ওপর সজোরে নিক্ষেপ করে পাশের ঘরে চলে গেলেন। বঙ্গারুস্বামী চেয়ার থেকে উঠে সেগুলি গোছাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এধরনের ঘটনা এই নতুন নয়। এর আগেও বহুবার এমনটা ঘটেছে। তবুও বঙ্গারুস্বামীর স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। পড়াশোনার থেকে ব্যবসার চিন্তাটাই তার মাথায় বেশিক্ষণ ধরে ঘুরপাক খায়। ক্লাসের মধ্যেও শুধু ব্যবসার কথাই ভাবে সে। কোন ব্যবসায় কত লাভ, তা হিসাব করতে করতেই পড়াশোনার বারোটা বেজে গেছে। বন্ধুরাও এজন্য কম বকাবকি করে না। তারাও বলে, বঙ্গারু, লেখাপড়ার সময় ওইসব আজগুবি চিন্তা বাদ দে।

বঙ্গারুস্বামীর সামনের মাসেই ফাইন্যাল পরীক্ষা। এই পরীক্ষার দিনটার জন্য সে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিল। পরীক্ষার আগে ব্যবসার চিন্তাও মাথা থেকে কিছু দিনের জন্য বাদ দিয়ে, লেখাপড়ায় আগের থেকে একটু বেশি মনোযোগী হল সে। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হল পরীক্ষা। পরীক্ষা আশানুরূপ হয়েছে বলে সে ইতিপূর্বেই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রশ্নের উত্তরে বহুবার বলেছে।

পরীক্ষা শেষের পর আর সময় নষ্ট করতে চাইল না সে। অনেকদিন থেকেই ব্যবসার সংকল্পটা চেপে বসেছিল। একেবারে মাথা থেকে বাদ দিয়ে দেয়নি। শত শত ব্যবসা ভাবার পর, অবশেষে পোলট্রির ব্যবসা করার

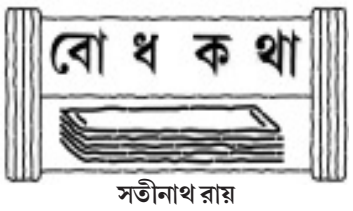

সতীনাথ রায়

কথা ভাবল সে। বঙ্গারুস্বামী সময় মতো মা'র কাছে প্রস্তাবটা রাখল। মা শোনা মাত্রই ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন। উত্তরে বললেন, তুই আমাদের সন্তান হয়ে কিনা মুরগীর ব্যবসা করবি! যেটুকু মান-সম্মান ছিল সেটুকুও তো দেখছি তোর জন্য খোয়াতে হবে। ছেলে মা'র কথার জবাবে শান্ত হয়ে বলল, দেখ মা, ব্যবসায় তোমাদের সম্মান নষ্ট হবে কেন? ব্যবসার মধ্যে তো কোনও খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আর তাছাড়া ব্যবসায় বড় হতে পারলে, লোকে তখন সুনাম করবে। মা ছেলের কথায় একটু শান্ত হয়ে বললেন, তুই মুরগী ছাড়া অন্য কোনও ব্যবসা কর না বাবা! বঙ্গারুস্বামী উত্তরে বললেন, মা, এই ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। আমার মন বলছে, এতে আমি ঠিক বড় হব। মা আর আপত্তি করলেন না। ছেলের ব্যবসায় প্রসন্ন না হলেও প্রাথমিক অনুমতিটুকু দিয়ে দিলেন। বঙ্গারুস্বামী নিজের গ্রামেই শুরু করল ব্যবসা। প্রথম প্রথম পাঁচজন পাঁচ কথা বললেও, সে কথায় কর্ণপাত করেনি সে। আস্তে আস্তে ব্যবসার স্থিতি ভালো হতে লাগল। বাইরে থেকে মুরগী নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়াও চলতে লাগল। বঙ্গারুস্বামীর ব্যবসা অল্পদিনের মধ্যেই ফুলেফেঁপে উঠল। শুধু নিজের শহরে নয়, ১২টি রাজ্যে তাঁর 'সগুনা' ফার্ম বেড়ে উঠল। ১৫ হাজার কর্মচারী এখন এর সঙ্গে যুক্ত। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তাঁকে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাঁর বর্তমান লেনদেন বছরে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা।

কোয়েম্বাটুর থেকে ১৩০ কিমি দূরে গ্রাম উদুমালপেটের এটা ঘটনা।

বিচিত্র খবর
বিচিত্র সংবাদ

নির্মল কর

তিরুপতি মন্দিরে 'তুলাভরম্' নামে একটি বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়, যার বৈশিষ্ট্য হল এতে যিনি পুজো দিতে আসেন, তাঁকে দাঁড়িপাল্লায় সমপরিমাণ ওজনের সোনা বা রুপোয় মাপা হয়। পুজো সমাপনান্তে ভক্তকে ওই পরিমাণ সোনা বা রুপো মন্দিরে দান করতে হয়।

❋ ❋ ❋

মধ্যযুগের অ্যালকেমিস্টরা নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল না হলেও গবেষণায় তাঁরা আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলেন সালফিউরিক, নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিকের মতো তীব্র অ্যাসিড।

❋ ❋ ❋

লন্ডনের এক যুবক একটি মেয়েকে বহুদিন ধরে বহুবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পর সাত দিনের মধ্যে সে আর কোনও প্রস্তাব দিচ্ছে না কেন তার কারণ জানতে চাইলে যুবকটি তার ডায়েরির পাতা উল্টে জানায়, এ পর্যন্ত সে ১৯৩১ বার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছে। কিন্তু—। মেয়েটি তখন যুবককে আর একবার প্রপোজ করতে বলে। প্রস্তাবে মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। কৌতূহলী যুবককে আশ্চর্য হতে দেখে মেয়েটি বলে, '১৯৩২ সালে আমার জন্ম কিনা!'

❋ ❋ ❋

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারি দেখাশুনা করতে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আলুর চাষ শুরু করেন। পরন্তু চাষীদের কাছ থেকে ধান, পাট কিনে সেসব বাজারে বিক্রির কারবারেও নেমেছিলেন।

❋ ❋ ❋

দিনের বেলা আকাশের তারা দেখা যায় না। কিন্তু পাতকুয়োর অতলে দিনের আলোতেও আকাশের তারা মিটিমিট করতে দেখা যায়।

❋ ❋ ❋

একাদশ শতাব্দীর চীনে বাড়ির কারুর মৃত্যু হলে জ্যোতিষীরা বিধান দিতেন—বাড়ির ঠিক কোন দিক দিয়ে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যেতে হবে। নইলে নাকি শাপ লাগবে বাড়িতে। তাই ভয়ে ভয়ে প্রায় সকলেই জ্যোতিষীদের নির্দেশ শুনতেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির দরজা জানালা বা দেওয়াল ভেঙে ফেলতে হতো। মার্কো পোলোর লেখা বিবরণ থেকে এই তথ্য জানা যায়।

❋ ❋ ❋

সম্রাট পিটার দি গ্রেটের কন্যা রুশ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ পেট্রোভনার (১৭০৯-১৭৬২) পিঙ্ক রঙটির প্রতি অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল। অন্য কোনও মহিলাকে এই রঙের পোশাক পরে চলাফেরা করতে দেখলে রাণী অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়তেন। সুতরাং হিংসুটে রাণী এক হুকুম জারি করে সকলকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর সাম্রাজ্যে কোনও মহিলাকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পিঙ্ক রঙের পোশাক পরতে দেখা গেলে তা হবে অতি দণ্ডনীয় অপরাধ। অভিযুক্ত আসামীর অঙ্গচ্ছেদ বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন কিংবা একসঙ্গে দুটি দণ্ডই দেওয়ার আদেশ বলবৎ ছিল।

❋ ❋ ❋

মানুষের দেহে প্রতি বর্গ ইঞ্চি তে বাস করে ৩.২ কোটি ব্যাকটেরিয়া— গোটা দেহে গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি।

প্রণব কন্যা সঙ্ঘের প্রথম সভানেত্রীর মহাপ্রয়াণ

গত ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শে গঠিত প্রণব কন্যা সঙ্ঘের প্রথম সভানেত্রী, সন্ন্যাসিনী সেবানন্দময়ী মা ৮০ বৎসর বয়সে শ্রীগুরুপদে লীন হয়ে যান।

১৩৩৬ সনের ১৪ই শ্রাবণ, পূর্ববাংলার ঢাকা জেলার নারিলা গ্রামে ঁজগদীশ চন্দ্র মজুমদার ও মনোরমা মজুমদারের কন্যা রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ইন্দ্রাণী মজুমদার। বড়িশা গার্লস স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে তিনি সমাজ কল্যাণ দফতরের একজন দক্ষ আধিকারিক রূপে কাজ করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিদগ্ধ লেখক ও তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি দীক্ষা নেন।

স্বীয় গুরুর মহাপ্রয়াণের পর তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর প্রচেষ্টায় আরও চারজন গুরু-বোনের সঙ্গে ১৯৭১ সনে বারাসতের হৃদয়পুরে গঠন করেন প্রণব কন্যা সঙ্ঘ। সেই সময় থেকে দীর্ঘ ৩৮ বছর তিনি একজন দক্ষ সভানেত্রী রূপে সঙ্ঘের সেবা করেন।

সঙ্ঘ-গঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছগুত্র.গৃ.তু.গ্ন দীর্ঘকাল শিক্ষকতাও করেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি, কর্মকুশলতা, ঐকান্তিক সেবা, নিষ্ঠা, দায়িত্বপরায়ণতা ও গুরুভক্তি প্রণব কন্যা সঙ্ঘকে বিশালাকার রূপ দেয়। কেওড়াতলা শ্মশান ভূমিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। অন্তিম যাত্রা পথে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজনীয় সন্ন্যাসীগণ তাঁকে মাল্যদান করেন।

বারাসাতে ক্যাম্প-এর সম্মেলন

নির্মলচন্দ্র আইচ ।। গত ১ ফেব্রুয়ারি বারাসাতের সুভাষ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হল ক্যাম্প (ক্যাম্পেন এগেনস্ট এট্রোসিটিস অন মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ)-এর ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। দীপ জ্বেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন লেখিকা এষা দে, মিঃ এম শীতল (নেদারল্যান্ড), টমাস ডি রায় (আমেরিকা), দেবব্রত চৌধুরী (লন্ডন), রাণা দাশগুপ্ত ও রোজালিন কোস্টা (বাংলাদেশ) প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে আহ্বায়ক মোহিত রায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও এপারে আশ্রিত শরণার্থীদের হয়রানির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এষা দে ওপার হতে বিতাড়িত সংখ্যালঘু ও মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সমভাবে গ্রহণ করে বক্তব্য রাখায় সভাগৃহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

সাংবাদিক সুমি খান এর বিরোধিতা করেন। ডাঃ নির্মল চন্দ্র আইচ মিঃ খানের সমর্থনে 'শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী কারা?' শিরোনামে স্ব-লিখিত নিবন্ধের কপি এষা দে'র হাতে তুলে দেন।

সমাবেশ সমাচার

জনমনে প্রশ্ন, সম্প্রতি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান আসবে কি না? ক্ষেত্র বিশেষে সমস্যার বহর পাক আমলের চেয়েও বহুগুণ বেশি বেড়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় ধর্মবিল ছাড়াও এনিমি প্রোপার্টি আইন, জন প্রতিনিধিত্বে বৈষম্য, চাকরী ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বৈষম্য, ছুতা-নাতায় দেব বিগ্রহ লাঞ্ছনা সহ মন্দির ভাঙচুর, ডাকাতির নমুনায় ধর্ষণ ও অপহরণ ইত্যাদির অবসান হবে কতটা?

নদীয়ায় অর্শ চিকিৎসা শিবির

সেবা ভারতীর নদীয়া জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৭ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল পাঁচটি অর্শ চিকিৎসা শিবির। শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, তেহট্ট এবং দেবগ্রামে এই শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১১৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। প্রত্যেকটি শিবিরেই সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তারা উপস্থিত থেকে সহায়তা করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর জেলার সোদপুর জেলা কলেজ ছাত্র প্রমুখ শঙ্কর রায় ও সুলেখার বধূবরণ অনুষ্ঠানে জেলার সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে মঙ্গলনিধি প্রদানের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যবাহ কাজল সিকদার মঙ্গলনিধি বিষয়ে সবাইকে অবগত করান ও নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানান। শঙ্করের মা মঙ্গলনিধি স্বরূপ ৫০১ টাকা প্রদীপ দে-র হাতে তুলে দেন।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার দীর্ঘকালীন বিস্তারক সোমকান্তি দাসের পিতা সুনীল কুমার দাস গত ২২ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। স্ত্রী সহ তাঁর দুই পুত্র এক কন্যা বর্তমান।

♠♠♠

চলে গেলেন বর্ধমান জেলার কালনা নিবাসী জনার্দন পান। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার সময় থেকেই তিনি সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। দীর্ঘদিন সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজও করেছেন।

পুত্র-কন্যা সহ তাঁর নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

♠♠♠

পুরুলিয়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা জেলা একল বিদ্যালয় প্রমুখ রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মাতৃদেবী ৯ ফেব্রুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। দুই পুত্র তিন কন্যা সহ তিনি নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

♠♠♠

লিলুয়া প্রভাত শাখার মুখ্য শিক্ষক অনিল কুমার রায়ের স্ত্রী গত ১৩ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন।

জীব উদ্ধার লাগি

(৯ পাতার পর)

বাক্য—**কাঁহা গেলে তোমা পাই/তুমি কহ তাঁহা যাই।** এর মধ্যে মহাপ্রভু হারিয়েছেন তিনি আত্মসম পরিকরকে। স্বরূপ দামোদর, ভক্ত হরিদাস ও পঞ্চ সখার অন্যতম ওড়িয়া ভক্ত বলরাম দাসকে।

জীবনের ২৩টি বছর তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সংকীর্তন মহিমাকে। সে যজ্ঞে ছিল সবার অধিকার। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, ধনী, দরিদ্র সেই যজ্ঞে অধিকারত্বের একমাত্র মাপকাঠি—**"কৃষ্ণ ভজনে নাহি-জাতিকুলের বিচার।"** এইভাবে কলিযুগের যুগধর্ম সংকীর্তন মহিমাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, কৃষ্ণপ্রেমের রসানুভূতিকে সকলের মধ্যে জাগ্রত করে ১৫৩৩ সালের ২৭শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে সচল জগন্নাথ সমাহিত হলেন দারুব্রহ্ম জগন্নাথে। নদীয়ার চাঁদ অস্তমিত হলেন নীলাচলের নীল সাগরে ৪৭ বছরের লীলায় যতি চিহ্ন টেনে। তাঁর ঐশীলীলা দর্শনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো তাঁর লীলাগ্রন্থ রচয়িতারা তাই গভীর প্রত্যয়ের সাথে বলতে পেরেছেন—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই।।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য

(১১ পাতার পর)

শ্রীচৈতন্য প্রেমলীলাকে যদি একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে অদ্বৈতপ্রভুকে ওই বৃক্ষের স্কন্ধ বলা যায়।

শাখার উপরে দুই হলেন স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আন নিত্যানন্দ।।

অদ্বৈত আচার্যকে যেমন গৌর আনা গোস্বামী বলা হয়, তেমনি এক হিসাবে তিনি আবার গৌরলীলা সঙ্গোপনেরও কর্তা। অর্থাৎ স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথকে ধরাধামে এনেছিলেন তিনি এবং বিসর্জনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। শ্রী চৈতন্যদেবের বয়স যখন আটচল্লিশ বছর, সেই সময় তিনি একখানি তরজা লিখে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ জগদানন্দর হাতে দিয়ে আদেশ করলেন যে তিনি যেন নীলাচলে গিয়ে এই তর্জাটি শ্রীচৈতন্যদেবের কর্ণগোচর করেন। তরজাটি এইরূপ—

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিয় লোকে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিয় কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল।।

এই তরজা শোনার পর থেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবান্তর হয় এবং তাঁর কৃষ্ণবিরহদশা দ্বিগুণভাবে বর্দ্ধিত হয়, যার প্রকৃত পরিচয় একমাত্র রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর জানতেন।

অদ্বৈত আচার্য ১২৩ বছর কাল প্রকট ছিলেন। আবির্ভাব সকলের পূর্বে তিরোভাব সকলের পরে। তাঁর দেহসমাধি বলে কোনও অস্তিত্ব নাই। অদ্বৈত আচার্য মহাবিষ্ণু, তিনি সদাশিব, সীতাপতি তিনি, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আদরের ন্যাড়া। ভক্ত হৃদয়ে তিনি ভগীরথ।

ভাবনার দ্বিভুজ

(৮ পাতার পর)

চলেন দেবী প্রাণাধিক গৌরসুন্দরের। নয়নে নামে শ্রাবণের ধারা। ঝাপসা দৃষ্টি মেলে তৃষিত নয়নে পান করতে থাকে নবদ্বীপ-বিহারীর বদনকমল-সুধা। অর্চনা শেষে জপে বসেন প্রিয়াজী। বেশ কিছু চাল পাশে থাকে। নামের সংখ্যা রাখেন চাল দিয়ে। জপ শেষ হতে হতে বিকাল গড়িয়ে যায়। নামের সংখ্যায় ব্যবহৃত তণ্ডুল কটি ফুটিয়ে ভোগ নিবেদন করেন যখন, তখন সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে ওঠে দিকে দিকে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে বিরহিণী যেন একাত্ম হয়ে যান দয়িতের সঙ্গে। বাহিরের অন্ধকার প্রিয়াজীর অন্তরের বিরহানলকে বহুগুণে প্রজ্বলিত করে। বহুদূরে নীলাচলের গম্ভীরায় যিনি কাঁদছেন তাঁর অন্তরে এই ব্যথার পরশ লাগছে কি?

অন্ধকার গাঢ় চারিদিকে। নিঃসীম অন্ধকারে আকাশে জাগ্রত তারকারাজি অধীর হয়ে ওঠে। প্রদীপের ম্লান আলোয় বিরহিণীর রূপটি বড় বিচিত্র লাগে। শয্যায় শয়ানা শচীমা আর উঠতে পারেন না। 'নিমাই', 'নিমাই', করে কেঁদে কেঁদে এখন একেবারেই চলচ্ছক্তিহীনা। অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন বৌমাকে। না, কিছু হয়নি সে সান্ত্বনাবাক্যে, তপস্বিনীকে তার তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

এইভাবে কেটে চলে দিন। নবদ্বীপ গম্ভীরার এই চিত্র ভাবুকের অন্তরে আনে বিস্ময়। নবদ্বীপ থেকে বহুদূরে নীলাচলে যে বিরহদৃশ্যের অবতারণা, তার প্রতিরূপ যেন ভাবুক দেখতে পান নবদ্বীপের ধ্যানমন্দিরে। তফাৎ এই, বিরহিণী এখানে গৌরবিরহকে আস্বাদন করে চলেছেন অহরহ। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁর আর কিছু নেই। অবলম্বন শুধু গৌরসুন্দর। বিরহিণীর নয়নজলে সিক্ত হয় নদীয়াবিহারীর পরিত্যক্ত পাদুকা, সিক্ত হয় বিগ্রহের চরণযুগল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সখী অনুভব করেন তাপসী প্রিয়ার তপস্যার গভীরতাকে। কালিদাসের অপর্ণা তপস্যান্তে পেয়েছিলেন দয়িতকে, আর এই তাপসী!! আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কেবল সরে যান।

(লেখক বিখ্যাত কথাকার ও গবেষক)

কমনওয়েলথ গেমস ঘিরে ঘোর অনিশ্চয়তা

জয়দীপ বন্দোপাধ্যায়

কমনওয়েলথ গেমস, ২০১০ দরজায় টোকা মারছে। অথচ এখনও ঘুম ভাঙেনি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কর্তাদের। অলিম্পিয়াডের পর সর্ববৃহৎ বিষয় যার প্রস্তুতিতেই লেগে যায় চার-পাঁচ বছর। অথচ ভারত ২০০৪-এর মার্চে জামাইকায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েও এখনও সমস্তরকম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারল না। বেশিরভাগ স্টেডিয়াম, রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার, হোটেল অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায়।

লন্ডনস্থ কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের সদর দপ্তর ইতিমধ্যেই ভারতকে হুশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সব ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে তাদের এক প্রতিনিধিদল খুব শিগগিরি ভারতে আসবে। ২০১০-এর যদিও শেষপর্বে এই গেমস অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে তার অন্তত একবছর আগে সব কাজ মোটামুটি সেরে ফেলতে হবে। অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়াড, বিশ্বকাপ ফুটবল সর্বত্র এই নিয়ম প্রযোজ্য। কারণ শেষ দশ-বারো মাস চলে ফিনিশিং টাচ। তখন নতুন করে আর কোনও কিছু নির্মাণ করা চলে না।

তাই ভারতের এখন শিরে সংক্রান্তি। একবার যদি কমনওয়েলথ কর্তাদের রোষে পড়ে এই গেমস ভারতের হাতছাড়া হয়ে যায় তার প্রতিক্রিয়া পড়বে সর্বব্যাপি।

কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনকে বিশাল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিদেশী টিভি সত্বাধিকারীদেরও সমপরিমাণ অর্থ দিতে হবে ক্ষতিপূরণ বাবদ। ট্রাভেল এজেন্সিগুলিও কড়ায় গন্ডায় সব হিসেব বুঝে নেবে। তারা ইতিমধ্যেই একলাখের বেশি বিদেশী পর্যটক তথা ক্রীড়াপ্রেমীর ভ্রমণের ও হোটেলের ঘর বুক করে রেখেছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার ভারতকে আগামী কুড়ি বছর বিশ্বমানের কোনও ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠন থেকে বঞ্চি ত করে রাখা হবে। আর ভারতে বিদেশী জিনিসের ও শিল্প তথা বাণিজ্যের আদান-প্রদানও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সামাজিকভাবে বিশ্ব সংসারে ভারত একঘরে হয়ে যাবে, আর অর্থনীতির মেরুদন্ডটাই ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

ভারতে বিদেশী পর্যটক আসাও কমে যাবে এর ফলে। তাই সবদিক থেকে ভারত চলে যাবে অন্ধকার যুগে। সে ব্যাপারে অবশ্য আমাদের ক্রীড়াকর্তা ও মন্ত্রী-আমলাদের কোনও হেলদোল নেই। এই ক'দিন আগে ঘটা

করে বাজেট পেশ হল। যথারীতি সবচেয়ে বেশি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে প্রতিরক্ষাখাতে। অথচ ভারতের যা ম্যান-পাওয়ার আছে তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সমস্ত জঙ্গি শিবির গুড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সদিচ্ছার অভাব, তাই জঙ্গিরা চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে ভারতের নিরীহ জনসাধারণের প্রাণ কেড়ে নেবে, সম্পত্তি ধবংস করবে আর কাঠের পুতুল হয়ে আমাদের নেতারা পার্লামেন্টে বাগাড়ম্বর করে যাবে। ইজরায়েলকে দেখেও এরা শিক্ষা নেয় না। তাই বছরের পর বছর ডিফেন্সে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে যাওয়া হবে আর আসল যুদ্ধ ক্ষেত্র ক্রীড়া খাতে প্রতিবছর একই বাজেট বরাদ্দ।

অলিম্পিকে তিনটি পদক পাওয়ার পরও এদেশে ক্রীড়া সচেতনতা বাড়েনি। তাই কমনওয়েলথ গেমসের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারছে না নেতারাও। আমেরিকা তাদের বাজেটের অনেকটা খরচ করে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা খাতে। অথচ তারা সমরাস্ত্রও তৈরি করে, যুদ্ধও করে অহরহ দরকার পড়লে। ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ ক্রীড়া খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে। এশিয়ায় চীন, জাপান, কোরিয়াও তাই। এই সব উন্নত দুনিয়ার দেশ জানে-বোঝে খেলাধূলার মাঠই হল বিশ্বের প্রকৃত যুদ্ধ ক্ষেত্র, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমন্বয়ের ভরকেন্দ্র। তাই এসব দেশ সবদিক থেকে উন্নত। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে—দি ওয়ার অফ ওয়াটারলু ওয়াজ ওন অন দি প্লে গ্রাউণ্ড অফ ইটন অ্যান্ড হ্যারো। খেলা, সংস্কৃতিতে উন্নতি করলে জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নৈতিক ও ব্যবহারিক বিকাশ ঘটে। আমরা এই বোধশক্তির অভাবে পিছিয়ে আছি।

২০১০-র কমনওয়েলথ গেমস সফলভাবে সংগঠন করতে পারলে ২০১৬ বা ২০২০ অলিম্পিয়াড আয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতের দাবি জোরদার হবে। বিশেষ করে ২০২০-র অলিম্পিকের ক্ষেত্রে ভারত প্রতিদ্বন্দ্বী ছয় দেশকে টেক্কা দেবে এমনটাই মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। আর স্বামী বিবেকানন্দ থেকে ঋষি অরবিন্দ দুজনেই যে বলে গেছেন ২০১১ থেকে ভারতের উত্থান সুরু হবে যা পূর্ণতাও পাবে ২০২০ সাল নাগাদ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামও বলছেন— ভিশন ২০২০। কাকতালীয় হলেও সত্যি যদি ভারত ২০২০-র অলিম্পিয়াড আয়োজন করতে পারে, তাহলে এই স্বপ্ন পুরোমাত্রায় সফল হবে। পৃথিবীর যেসব দেশ একবার করে এই অলিম্পিয়াড আয়োজন করেছে তারা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবদিক থেকে উন্নতির চরম শিখরে উঠে গেছে। তাই ২০১০-র কমনওয়েলথ গেমস হাতছাড়া হলে ভারতের কী যে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে সে সম্পর্কে সরকারি কর্তাব্যক্তি ও জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিরন্তর খবর ও প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করতে থাকুক। দেশে জনমত সংগঠিত হোক। যাতে আই ও এ এবং সরকার এই ১৮ মাসে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ফেলতে বাধ্য হয়।

মহসিন শেখের ১৮ পোলা আল্লা বকরত দে, বরকত দে

শিবাজী গুপ্ত

নাম—মহসিন শেখ। গ্রাম—নিমতলা। কাহালা গ্রাম পঞ্চ ায়েত। থানা—রতুয়া জেলা—মালদহ।

ছেলের সংখ্যা ১৮ জন। মেয়ের সংখ্যা দেওয়া নেই। ৬ ছেলে বাইরে থাকে। বাকী ১২ জন ছেলে নিয়ে মহসিন গ্রামেই থাকে। ছেলেদের পেশা—গ্রামের মহিলা ও ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করা। ১৩ বছর থেকে ৫০ বছর অবধি গ্রামের মেয়েরা মহসিনের ছেলেদের হাতে নির্যাতিত হয়।

গ্রাম পঞ্চ ায়েতের প্রাক্তন সিপিএম প্রধান অশোক মণ্ডল এবং বর্তমান কংগ্রেস প্রধান তাপস সুকুল দু'জনই মহসিন শেখের ছেলেদের দুষ্কর্মের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে তারা নিজেরা কি করেছেন বা করতেছেন তার কোনও উল্লেখ নেই।

না থাকারই কথা। মহসিন শেখের কয়জন বিবি থেকে ১৮টি ছেলে। এক সঙ্গে চার বিবি পোষার সামর্থ্য না থাকলেও, বিবি বদল করে করে প্রত্যেক বিবি থেকে চার-ছয়টা বাচ্ছা পয়দা করতে তো মানা নেই।

ধরে নেওয়া যাক মহসিন শেখ ও তার তিন বিবি। তা হলে হল গিয়ে চারজন।

১৮ পোলার একটা করে বিবি হলেও (যা অবিশ্বাস্য) ১৮ বিবি। তাতে দাঁড়াল ১৮ ন ১৮ ঞ্চ ৩৬ জন। এই ১৮ পোলার কত ছেলে মেয়ে তারও উল্লেখ নেই। একটা করে হলেও (যা একেবারেই অস্বাভাবিক) ১৮ জন।

তাহলে মহসিন শেখের বাড়িতে ভোটার সংখ্যা হল—৪ ন ১৮ ন ১৮ ন ১৮ ঞ্চ ৫৮

অর্থাৎ একটি বাড়িতেই কমপক্ষে ৫০টি ভোটার। সুতরাং নিমতলা গ্রামের মহিলারা জল আনতে গেলে বা স্কুল যাতায়াতের পথে মহসিন শেখের পোলাদের হাতে যতই নির্যাতিত হোক কিংবা ওই গ্রামের—মহিলাদের কেউ বিয়ে করতে না চাক বা গ্রামের মেয়েদের বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক হোক, তাতে সিপিএম বা কংগ্রেসী প্রধানের কিছু যায় আসে না। এক বাড়ি থেকেই কমসে কম ৫০টি ভোট ছাড়া যায়? একটা পুরো হিন্দু পাড়া ঢুঁড়লেও তো ৫০টি ভোটার পাওয়া যাবে না। সুতরাং মুসলমান সমাজে যত বেশি সংখ্যক মহসিন শেখের মতো ১৮ ছেলের আব্বা গজাবে সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস ও আগাছা কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমানদের পায়ে গড়াবার কম্‌পিটিশান তত জোরদার হবে। আল্লা বরকত দে! আল্লা বরকত দে! (সূত্রঃ আনন্দবাজার-২৩/১/০৯)

২৯শে জানুয়ারি হঠাৎ-নেতা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের আগ্রাসী মনোভাব এবং গাজা ভূখন্ডে আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। তাতে ৪০ হাজার মুসলমান জড়ো হয়ে ইজরায়েলের মুণ্ডুপাত করে। সে সঙ্গে প্যালেস্টাইনীয় মুসলমানদের জন্য মমতা ব্যানার্জীর কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনেরও কঠোর সমালোচনা করে। সিদ্দিকুল্লাহ এবং মমতা ব্যানার্জী তো এক সময় সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। হঠাৎ পীরিতে চিড় ধরল কেন? সিদ্দিকুল্লাহ জানায়—"তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে মুসলিম প্রীতি দেখিয়ে সস্তা রাজনীতি করছে। এটা বাংলার মুসলিমরা মেনে নেবে না।" কয়েক মাস আগে লিখেছিলাম মুসলমানের কান্না মুসলিমরাই কাঁদবে। অন্য কোনও নেতা-নেত্রীর নকল কান্নায় তারা ভুলবে না। তারা জানে এই কান্না তো ভোটের কান্না, স্বার্থোদ্ধারের কান্না। অন্তরের রোদন নয়। মমতা ব্যানার্জী যদি ইসলাম কবুল করে কাঁদতেন, তা হলে মুসলমানরা ঝুড়ি ভরতি করে তাকে ভোট দিতেন। (সূত্রঃ দৈনিক স্টেটসম্যান-২৯.১.০৯)

মুসলমানদের শিকড় যে আরব মরুভূমিতে প্রোথিত এই সমাবেশই তার প্রমাণ। একজন দলহীন ব্যক্তির ডাকে ৪০ হাজার লোক জড়ো হয়েছে। অনেক বড় দল ও নেতার ডাকেও ৪০ হাজার লোক সমবেত হওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

সুতরাং ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? একদিকে মহসিন শেখের ১৮টা ছেলে, আরেকদিকে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর ডাকে ৪০ হাজার লোকের সমাবেশ। তার থেকে এটা স্পষ্ট ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হয় তো পশ্চিমবঙ্গের শেষ হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী—অবশ্য তার যদি হিন্দু পরিচয় দানে কোনও কুণ্ঠা না থাকে; আর মুখ্যমন্ত্রী হবার পথের কাঁটা তুলতে গেলে মমতা ব্যানার্জীকে শুধু রিজওয়ানের মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁদলেই হবে না, সারা দেশে যত মুসলিম সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে তাদের বিনা শর্তে মুক্তিদানের জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাকে তারস্বরে স্লোগান দিতে হবে ঃ—

তাই তাই তাই, মোল্লা বাড়ি যাই
মোল্লা দিল রুটি গোস্ত, দুয়ারে বসে খাই।
সন্ত্রাসী আর জেহাদীরা আমার দোস্ত ভাই,
অবিলম্বে সব সন্ত্রাসীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই।
হিন্দু মারা গেলে আমার কোনও খেদ নাই,
জান দেব, জাত দেব, তবু মুসলিম ভোট চাই।
দেশ যাক রসাতলে ধর্ম-যাক গোল্লায়,
মুসলিম ভোটে বরকত হোক—সিন্নি দেব আল্লায়।।

Swastika
9 March - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

বিষ্ণুপুরের পরাজয়ে সিপিএম দিশাহারা

(১ পাতার পর)

প্রথমেই বোঝা যায় সি পি এম ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছে।

দীর্ঘদিন জ্যোতি বসু সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় উপস্থিত থেকে যা বলেছেন তা হল -- (১) রাজ্য নেতৃত্বের আচরণ এবং প্ররোচনামূলক কথাবার্তায় মানুষ বিরূপ হয়েছে।

(২) পার্টি নেতৃত্বের ভুল কৌশলের ফলে বামফ্রন্টের অস্তিত্ব নেই। এখানে উল্লেখ্য, বিমান বসুর আচরণের ফলে আর এস পি নেতা মাখন পাল প্রমোদ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন -- 'আমি আর ফ্রন্টের সভায় আসব না। আমি মিসফিট।'

(৩) রাজ্য সরকার তথা সাংসদদের টাকা পড়ে থাকার দরুন কাজ বন্ধ হয়ে যায় কেন? তিনি বলেছেন—"কেন্দ্র তো এখন যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করছে, কেন এই সুযোগ আমরা নিতে পারছি না।" জনসাধারণ বিরূপ—তাই এখন "কর্ম-যজ্ঞ" দেখা যাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় কলকাতা পুরসভাও নেমে পড়েছে। জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য গ্রামে গ্রামে গৌতম দেবের দপ্তর সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তিন দশকের পর ঘুম ভাঙছে। নির্বাচন অতি বিষম বস্তু। এখন ভোটারদের দেব-সুলভ মান্যতা। এতদিন মন্ত্রী-বিধায়ক-সাংসদরা ফিরেও তাকায়নি।

(৪) জ্যোতি বসু বলেছেন—তলায় তলায় কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল ঐক্য হলে বিপদ আসন্ন। তিনি বলেন, "পার্টির ছেলেরা ভয় পেয়ে এলাকা ছাড়ছে।" এরপরই পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে—অস্ত্রের মারফৎ "এলাকা উদ্ধার" করা হবে। আর এর প্রতিরোধে তৃণমূলও অস্ত্র ধরবে। রাজ্য এবার হিংসাশ্রয়ী সংঘর্ষের পথে যাচ্ছে।

নির্বাচন ঘোষণার আগেই সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক "ঘুষ" (?) রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। এবার প্রচারে-বিজ্ঞাপনে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। একসময় কংগ্রেস এন ডি এ সরকারের বিজ্ঞাপন দেওয়াকে সমালোচনা করেছিল। আর বর্তমানে কংগ্রেস সরকার রাজ্যের দৈনিকগুলিকে প্রায় একশ'র কাছাকাছি বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এক একটা কাগজে প্রায় দশটি করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারও পিছিয়ে নেই।

জ্যোতি বসু শিল্পায়নের জন্য জমি দখলের পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনা শোনার ফলে বুদ্ধদেববাবু আর রাজ্য-কমিটির সভায় উপস্থিত হননি। রাজ্য-কমিটিতে প্রার্থী বাছাই নিয়েও তীব্র মত-বিরোধ দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও কেন্দ্রে কংগ্রেসের ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। সোনিয়া গান্ধী কার্যত ইউপিএ ভেঙে দিয়েছেন। বিপরীতে একক পার্টি হিসাবে বিজেপি-র অভ্যুত্থান অসম্ভব নাও হতে পারে। যদিও এ রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব-বিশেষ করে প্রণব মুখার্জি-এর সঙ্গে সিপিএম-এর বোঝাপড়া ভালোই হয়েছে। তবুও জনতা-জনার্দন শেষ পর্যন্ত কোনদিকে যাবেন তা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারবেন না।

সিপিএম-আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লক এই তিনটি পার্টির প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। এই ফাঁকে সিপিএম-এর সুদিন চ্যাটার্জিকে ফরওয়ার্ড ব্লকে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকসভায় প্রার্থী করার বুদ্ধি দিয়ে বিমান বসু ফরওয়ার্ড ব্লক সুপ্রিমো অশোক ঘোষকে সম্মত করেছেন। কারণ বারাসাতে সরল দেব-কে প্রার্থী করতে অশোক ঘোষ রাজি নন। আরএসপি-তে সনৎ মন্ডলকে নিয়েও ঝামেলা চলছে। ফরওয়ার্ড ব্লক-আরএসপি-র তলার কর্মীগণ সিপিএম-কে "শিক্ষা" দেবার জন্য মন ঠিক করে ফেলেছেন। এই পরিস্থিতিতে আদর্শ-নীতি-শিল্পায়ণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব বিজেপি-র আছে। সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু সম্প্রতি সাংবাদিকদের সম্বন্ধে শ্লেষ-উপহাস-কটাক্ষ করেছেন। এর ফলে কিন্তু সিপিএম সম্পর্কে সাংবাদিকগণ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন।

পরিশেষে, সিপিএম বিদায়ী সাংসদদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ আছে। কাজেই তাঁদেরও বিরূপ-উক্তি শুনতে হবেই। মহঃ সেলিম কি এবারও "গুজরাট সি ডি" দেখিয়ে ভোট চাইবেন? মুসলিম অঞ্চলে সিপিএম-বিরোধী তৃণমূলী প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। দেওয়ালের লিখন অনেকেই পড়তে পারছেন না। অহংকারী নেতা-নেত্রীদের অভ্রংলেহি মনোভাব ক্ষতি করবেই।

আই এস আই-এর নির্দেশে জম্মু-কাশ্মীরে ঘাঁটি গাড়ছে জঙ্গি সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আই এস আই লস্কর-এ-তৈবা ও হিজবুল মুজাহিদিনকে পাকিস্তান অধ্যুষিত কাশ্মীরে তাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে মদত দিচ্ছে বলে সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা জানতে পেরেছেন। আই এস আই এ বিষয়ে দুই জঙ্গি সংগঠনকেই ভারতে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তারে কড়া নির্দেশ দিয়েছে।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী এই মুহূর্তে পাক অধ্যুষিত কাশ্মীরে হিজবুল মুজাহিদিনের ৪টি গোপন ঘাঁটি রয়েছে। যেগুলিতে কমপক্ষে ২৫টি রুম এবং ৩৫টি তাঁবু রয়েছে। ২৫০ জনেরও বেশি সমর্থক সেখানে যেকোনও সময়েই আশ্রয় নিতে পারে। এখন এই সমস্ত ঘাঁটিগুলিতে ৭০ জন সদস্য কাজ করছে। হাজিবুল্লার ঘাঁটিটিও এই অঞ্চলে বেশ সক্রিয় রয়েছে। সেখানে ১৪০ জনেরও বেশি সমর্থক থাকতে পারে।

তথাগত রায়
প্রাক্তন সভাপতি, পঃ বঃ রাজ্য বিজেপি
উঃ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী

ভবেন্দ্র নাথ বর্মন
সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ
কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী

শুভ
দোল পূর্ণিমা
তিথিতে
সকলকে জানাই
প্রীতি-শুভেচ্ছা
ও ভালোবাসা

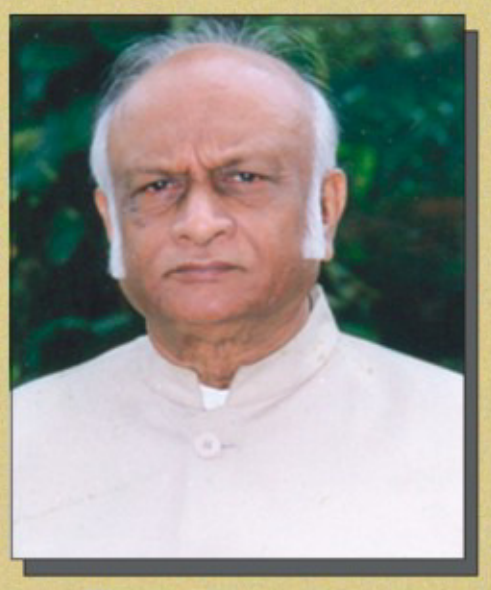

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, পঃ বঃ রাজ্য বিজেপি
কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী

প্রভাকর তেওয়ারি
সম্পাদক, পঃ বঃ রাজ্য বিজেপি
ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com